গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৬ বর্ষ ১৪ সংখ্যা ২১ নভেম্বর ২০০৩ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

মহান নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উদযাপিত

মহান নভেম্বর বিপ্লবের ৮৬তম বার্ষিকী উপলক্ষে এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে ১৭ নভেম্বর, ২০০৩ কলকাতার মহাজাতি সদনে একটি বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। মঞ্চে বিদেশ থেকে আগত ভ্রাতৃপ্রতিম দলের প্রতিনিধি সহ উপস্থিত সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ। (*বিস্তারিত সংবাদ আগামী সংখ্যায়*)

আর জি করের ঘটনায়

পুলিশি তদন্ত কোনওরকম প্রমাণই জোগাড় করতে পারেনি

বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং কর্তব্যে অবহেলার অজুহাতে রাজ্য সরকার আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের ছ'জন জুনিয়ার ডাক্তারকে শাস্তি দেবার সুপারিশ করার ঠিক এক সপ্তাহ পরে কলকাতা পুলিশ বলতে গেলে হাত তুলে দিয়েছে। অনেক চেষ্টা চালিয়েও তারা ভিন্ন ভিন্ন এফ আই আর-এ উল্লিখিত এঁদের পাঁচজনের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণ করা দূরের কথা, কোনও অভিযোগ পর্যন্ত খাড়া করতে পারেনি।

১ নভেম্বর আর জি কর হাসপাতালে মারা যাওয়া নিত্যগোপাল বণিকের আত্মীয়-পরিবারবর্গ ২ নভেম্বর ঐ পাঁচ ইনটার্নের বিরুদ্ধে তাঁদের এবং অন্যান্য রোগীদের আত্মীয়দের নিগ্রহ করার অভিযোগ এনেছিলেন। ঐ পাঁচজনের মধ্যে চারজনকে সাসপেণ্ড করা হয় এবং অন্য দু'জন হাউসস্টাফকে ডিউটি থেকে খারিজ করা হয়।

অথচ পুলিশ অনুসন্ধান চালিয়ে এঁদের বিরুদ্ধে "এক রত্তি প্রমাণও যোগাড়" করতে পারেনি এবং তাঁদের কোনও অপরাধও প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়নি। ডেপুটি কমিশনার (নর্থ) পি রবি বলেন যে, তদন্ত "খুব সামান্যই এগিয়েছে", তবে থানা পর্যায়ের অন্যান্য অফিসারেরা এ ব্যাপারে অনেক খোলামেলা।

এফ আই আর যে অভিসন্ধিমূলক, এই তদন্ত থেকে সেই বিশ্বাসই আমাদের হয়েছে, জানালেন চিৎপুর পুলিশ থানার এক অফিসার। "বোঝেনই তো, সব পলিটিক্যাল ব্যাপার, কি আর বলব।"

যে পাঁচজন ইনটার্নের নামে এফ আই আর করা হয়েছে, তাঁরা হলেন শুভঙ্কর চ্যাটার্জী, শুভজিৎ রায়, বিপ্লব চন্দ্র, রাকেশ শর্মা এবং দ্বৈপায়ন মজুমদার। প্রথম তিনজন এস ইউ সি আই-এর ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও'র সভ্য এবং শেষোক্ত জন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের একজন দরদী। কেবল রাকেশ একজন "অরাজনৈতিক" অভিযুক্ত।

অফিসাররা 'দি টেলিগ্রাফ মেট্রো'কে জানিয়েছেন যে, মূল অভিযোগকারী পাতিপুকুরের বণিক পরিবারের সদস্যরা ইতিপূর্বে যে পাঁচজনের নাম করেছিলেন, মনে হয় এখন তাঁদের সম্বন্ধে নতুন করে চিন্তাভাবনা করছেন। অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শীরা — যাঁরা অধিকাংশই বণিক পরিবারের প্রতিবেশী এবং যাঁদের বাড়িতে আলাদা আলাদা করে তদন্তকারী অফিসাররা গিয়েছিলেন, তাঁরা গোলমালে যুক্ত জুনিয়ার ডাক্তারদের একজনের নামও নিশ্চিত করে স্মরণ করতে পারেননি। চিৎপুর থানার এক অফিসার বললেন, "প্রতিবেশীদের একজন তো আমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি সম্পর্কেই প্রশ্ন তুলে বললেন, যে জুনিয়ার ডাক্তারদের আমরা ঘটনার আগে অথবা পরে কখনই দেখিনি, তাদের নাম করতে বলছেন কোন্ আক্কেলে?" ঐ অফিসার

দুয়ের পাতায় দেখুন

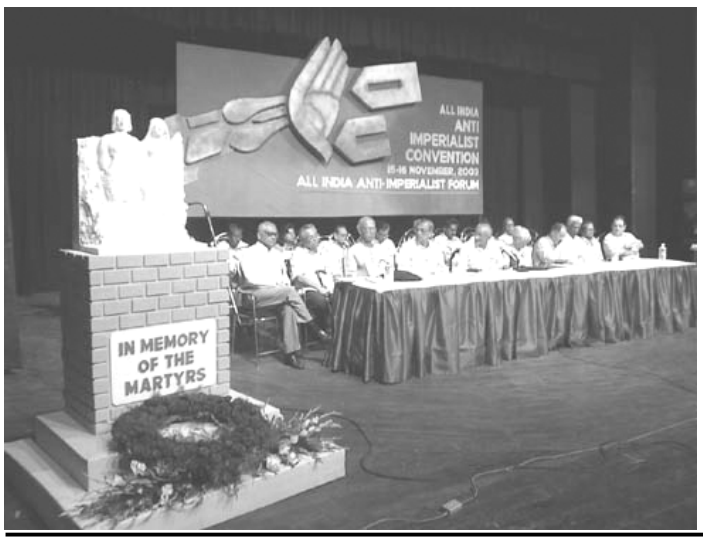

'ইরাক থেকে মার্কিন সেনা দূর হঠো'

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কনভেনশনে দৃপ্ত দাবি

'ইরাকে যুদ্ধ শেষ হয়েছে' — ১ মে মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই ঘোষণাকে নস্যাৎ করে দিয়ে ইরাকি জনগণ যখন অমিত তেজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ইয়াঙ্কিবাহিনীর বিরুদ্ধে, প্রতিদিনই যখন সেই মরণপণ আক্রমণের সামনে পড়ে নিহত হচ্ছে মার্কিন সৈন্যরা, ধ্বংস হচ্ছে মার্কিন যুদ্ধ কপ্টার, 'মার্কিন সেনা ইরাক ছাড়ো' এই আওয়াজ যখন বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠছে, তেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ইরাক থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের দাবিতে ভারতব্যাপী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে অল ইণ্ডিয়া অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের উদ্যোগে ১৫-১৬ নভেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কনভেনশন। দেশের ২০টি রাজ্য থেকে ১১৭৫ জন প্রতিনিধি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আমেরিকা, ফ্রান্স, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া ও বাংলাদেশের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের প্রতিনিধিরা। হলের মধ্যে সকল প্রতিনিধির স্থান হবেনা জেনেই হলের তিনতলাতেও প্রতিনিধিদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ক্লোজ সার্কিট টি ভি রাখা হয়েছিল সেখানে।

১৯৮৯ থেকে '৯১ সোভিয়েট ইউনিয়ন সহ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর বিশ্বে যখন ক্ষমতার ভারসাম্য পাল্টে গেল, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী শিবির অপ্রতিদ্বন্দ্বী

চারের পাতায় দেখুন

ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের রাজ্য কনভেনশন

আই ডি বি আই কর্মচারীদের আন্দোলনের সমর্থনে ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম, পশ্চিমবঙ্গ শাখার উদ্যোগে গত ১ নভেম্বর কলকাতায় মৌলালি যুব কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হল ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের এক কনভেনশন। এই কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতি কমরেড অমর রায়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন আই ডি বি আই-এর পূর্বতন একজিকিউটিভ ডিরেক্টর এবং ইউ বি আই-এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর সি আর সেনগুপ্ত। কনভেনশনে মূল প্রস্তাব পেশ করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড জগন্নাথ রায়মণ্ডল। মূল প্রস্তাবে আই ডি বি আই বিলোপ এবং তার প্রতিকারের বিষয়টিকেও যেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়, তেমনি ব্যাঙ্ক বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধেও কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। সরকারি শেয়ার ৩৩ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রায় সমস্ত ব্যাঙ্ক বাজারে শেয়ার ছেড়েছে। এর ফলে ব্যাঙ্কগুলিতে '৪০-'৫০ এর দশকের মত গ্রাহকদের গচ্ছিত টাকা বা কর্মচারীদের চাকরির নিরাপত্তা থাকবে না, লালবাতি জ্বলবে। একদিকে সুদের হার কমিয়ে দেওয়ায় সাধারণ গ্রাহকরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, অন্যদিকে কর্মচারীদের বেতনবৃদ্ধির বিষয়টিকে কর্তৃপক্ষ অবহেলা করছে। তারা ব্যাঙ্কে ১০০ শতাংশ কম্পুটারাইজেশন, ডিপ্লয়মেণ্ট, চাকুরির মেয়াদ কমানো এবং কর্মচারীদের আন্দোলন করার মৌলিক অধিকারগুলিকেও সঙ্কুচিত করছে।

ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়নগুলির প্রচ্ছন্ন সমর্থন এবং সহযোগিতার জন্যই ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্মচারী স্বার্থবিরোধী এ জাতীয় নীতি কার্যকর করতে পারছে।

প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন সারা ভারত ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের সভাপতি কমরেড এম সি ত্যাগী, ব্যাঙ্ক অফিসারদের সংগঠন এ আই বি ও এ'র রাজ্য সম্পাদক কমরেড দেবেশ ভট্টাচার্য, আই ডি বি আই এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনের কলকাতা শাখার সম্পাদক কমরেড বসন্ত রায়, এ আই সি সি টি ইউ-এর পক্ষে কমরেড অতনু ভট্টাচার্য এবং ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা।

সবশেষে সভাপতির ভাষণে ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা কমরেড অমর রায় বলেন — নরসিংহম কমিটির বেশিরভাগ সর্বনাশা প্রস্তাব হয় বাস্তবায়িত হয়েছে, কিংবা বাস্তবায়িত হওয়ার পথে। যে দু'টি প্রস্তাব অনতিবিলম্বে কার্যকর করার উদ্যোগ নেওয়া হবে সেগুলি হল — (১) বিভিন্ন ব্যাঙ্কগুলির সংযুক্তিকরণ। এর মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন বিশাল পরিমাণ পুঁজি সংহত হবে, তেমনি বহু শাখা বন্ধ হয়ে যাবে, বিশাল সংখ্যক কর্মী কাজ হারাবে। (২) শিল্পভিত্তিক চুক্তির পরিবর্তে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাঙ্কে ভিন্ন ভিন্ন চুক্তি নিয়ে আসা। এর অর্থ দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে সংগঠন গড়ে উঠেছে, যে সংগ্রামী ঐক্য গড়ে উঠেছে — তার বিলোপ, যা ব্যাঙ্ক আন্দোলনকে বিয়োগান্ত সমাপ্তির দিকে নিয়ে যাবে।

বিভিন্ন ব্যাঙ্কের কয়েক শত কর্মচারীর স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনের মধ্য দিয়ে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। আগামী দিনে এই সমস্যার বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলনের অঙ্গীকার গ্রহণের মধ্য দিয়ে সভা সমাপ্ত হয়।

উত্তাল গণবিক্ষোভে বলিভিয়ার প্রেসিডেন্ট দেশ ছেড়ে পালালেন

বিশিষ্ট বিপ্লবী নেতা চে গুয়েভারার স্মৃতি বিজড়িত মধ্য আমেরিকার সবচেয়ে দরিদ্র দেশ বলিভিয়ার উদার অর্থনীতি, বেসরকারীকরণ এবং আমেরিকায় গ্যাস রপ্তানির বিরোধিতা করে সম্প্রতি যে উত্তাল গণবিক্ষোভ হয়ে গেল, তার চাপে পড়ে সে দেশের ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট গনজালো সানচেজ দ্য লোজাদা ইস্তফা দিয়ে আমেরিকার মিয়ামিতে আশ্রয় নিয়েছেন। ইতিপূর্বে বিভিন্ন দেশের লুম্পেন ও স্বৈরাচারী শাসকরা আশ্রয় নিয়েছেন এই মিয়ামিতে। প্রেসিডেন্ট লোজাদার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন কার্লোস মেসা।

বলিভিয়া দেশটি পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস সহ বিভিন্ন খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। সে দেশের মাত্র ৬.৫ শতাংশ জমি কৃষির উপযোগী, এসব জমির সিংহভাগ ধনী জমিদার ও বিদেশি বহুজাতিকের কুক্ষিগত। ভূমিহীন চাষী ও খেতমজুর হচ্ছে গ্রামীণ বলিভিয়ার মোট জনসংখ্যার চারভাগের তিনভাগ। কোকা চাষ হচ্ছে সে দেশের মানুষের প্রধান জীবিকা। কোকা থেকে উৎপন্ন কোকেন ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আবার এই কোকেনই নেশার বস্তু হিসাবে ব্যবহার করে মার্কিন যুব সমাজ উচ্ছন্নে যাচ্ছে এই অজুহাতে কোকা চাষ বন্ধ করার ফতোয়া দিয়ে মার্কিন শাসকশ্রেণী ৯০-এর দশকে পেরু ও কলাম্বিয়ার সঙ্গে বলিভিয়াতেও কোকা চাষ বন্ধ করতে তৎপর হয়। প্রকৃত মতলব ছিল কোকা চাষ চিরতরে বন্ধ করা গেলে সে সব জমি মার্কিন বহুজাতিক সংস্থাগুলি জলের দামে কিনে নেবে এবং সেখানে রপ্তানিযোগ্য ফসল ফলিয়ে মুনাফার পাহাড় বানাবে। বাস্তবেও তাই ঘটেছে। বলিভিয়াতে কোকা চাষ বন্ধ হবার পর সে সব জমি মার্কিন বহুজাতিক ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানি কিনে নিয়ে সেখানে কলা ফলিয়ে বিদেশে রপ্তানি করে মুনাফার পাহাড় বানিয়ে চলেছে। আর জমিচ্যুত বলিভিয়ার কৃষক খেতমজুর বনে গিয়ে মার্কিন বহুজাতিকের কলার ক্ষেতে দৈনিক ১ ডলার মজুরির বিনিময়ে দিন গুজরান করে চলেছে। পেরু ও কলাম্বিয়াতে কোকা চাষ মার্কিন শাসকশ্রেণী বন্ধ করাতে সক্ষম না হলেও ১৯৯৮ সালে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের আমলে মার্কিন শাসকশ্রেণীর চাপে পড়ে বলিভিয়ার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হুগো বানজার সেনা নামিয়ে কোকা চাষীদের ফসল, খেত ও খামার পুড়িয়ে দেবার পর ৯০ শতাংশ জমিতে কোকা চাষ বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে লাখো লাখো খেতমজুর ও ভূমিহীন চাষী। এদের মধ্যে দারিদ্র্য, বেকারি অত্যন্ত ভয়াবহ। ৮৫ লক্ষ (৮.৫ মিলিয়ন) অধিবাসীর মধ্যে ৭০ শতাংশ মানুষ সরকার নির্ধারিত দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে। ইতিমধ্যে বলিভিয়ায় বেকারির হার ১৫ শতাংশে পৌঁছে গেছে। সংগঠিত শিল্পের শ্রমিকদের সাপ্তাহিক গড় বেতন হল ৫ ডলার।

ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে জমি বণ্টন, খেতমজুরদের জন্য সারা বছরের কাজের সুযোগ ও মজুরি বৃদ্ধি ইত্যাদি দাবি নিয়ে আন্দোলন করার তাগিদে ভূমিহীন চাষী ও খেতমজুরদের মধ্যে গঠিত হয়েছে পৃথক পৃথক শক্তিশালী সংগঠন। শহরের কলকারখানার শ্রমিকরাও শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছে। কয়েক দশক ধরে এ সংগঠনগুলির আন্দোলন করে আসার ধারাবাহিকতায় গড়ে উঠেছে বলিভিয়ার বৃহত্তম সংগ্রামী রাজনৈতিক সংগঠন 'মুভমেণ্ট ফর সোস্যালিজম', সংক্ষেপে (এম এ এস)। এর সর্বোচ্চ নেতা হলেন ইভো মোরালেস। '৮০-র দশকে গণআন্দোলনের ফলে বলিভিয়ায় পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্র ফিরে আসে। সরকারি ক্ষমতায় বসে নির্বাচিত সরকারগুলি বলিভিয়ার মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেণী এবং মার্কিন বহুজাতিকগুলির স্বার্থের প্রতিভূ হয়ে তাদের স্বার্থই দেখভাল করেছে। ভোটে জিতে যারা প্রেসিডেন্টের পদে আসীন হয়েছে তাদের অনেকেরই বিশাল বিশাল সম্পত্তি রয়েছে। গনজালো সানচেজ-এর সম্পত্তির মূল্য হচ্ছে ২২০ মিলিয়ন ডলার। মধ্য আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে তার বিনিয়োজিত পুঁজি ছড়িয়ে আছে। তিনি শুধু একজন কোটিপতিই নন, খনি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত এনরন কোম্পানির সঙ্গেও তাঁর গভীর ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। তাঁর স্থলাভিষিক্ত ভাইস প্রেসিডেন্ট কার্লোস মেসাও দেশের একজন বৃহৎ শিল্পপতি।

মার্কিন শাসকশ্রেণী ও বহুজাতিকগুলির স্বার্থে আই-এম-এফ ও বিশ্বব্যাঙ্কের নির্দেশে প্রেসিডেন্ট সানচেজ তাঁর পূর্বসূরীদের মতো বেসরকারীকরণ, মুক্ত বাণিজ্য এবং সরকারি ব্যয়সঙ্কোচনের নীতি, যা উদারনীতি নামে পরিচিত, তাকে বলিভিয়ার মাটিতে প্রয়োগ করতে আদা জল খেয়ে নেমে পড়েন। উল্লেখ্য, আজ লাতিন আমেরিকা বিশেষত বলিভিয়ার বেশিরভাগ মানুষের মনে 'উদারনীতি' নিয়ে কোনো মোহ নেই। তারা এটাকে দেশের সার্বিক উন্নতি কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ঘটানোর চাবিকাঠিও মনে করে না। দীর্ঘদিনের বাস্তব অভিজ্ঞতার নিরিখে তারা অনেকেই বুঝেছে, 'নয়া উদারনীতি' হচ্ছে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিশ্রেণী, বিদেশি ব্যাঙ্ক ও বহুজাতিকের কাছে দেশের বিপুল সম্পদ বেচে দিয়ে ধনীদের আরও ধনী হবার সুযোগ করে দেওয়া।

বিভিন্ন সময়ের বলিভিয়ার ক্ষমতাসীন সরকারগুলির জনস্বার্থবিরোধী নীতিকে কেন্দ্র করে সে দেশের সাধারণ মানুষের মনে সরকারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্ষোভ দানা বেঁধে উঠেছে এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে তার বহিঃপ্রকাশও ঘটেছে। বিদায়ী প্রেসিডেন্ট সানচেজ আগেও (১৯৯৩-৯৭) একবার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন এবং সেবারও তাঁর শাসনকাল কেটেছে প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয় বারের জন্য তিনি গত বছর ২০০২ সালের ২ আগস্ট ক্ষমতায় আসেন। দেশের ৮০ শতাংশ মানুষ তার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করা সত্ত্বেও দক্ষিণপন্থী দলগুলির সমর্থন ও মার্কিন ছলচাতুরিতে তিনিই ক্ষমতায় আসেন।

এ বছরের জানুয়ারি মাসে সানচেজ সরকারের উদারনীতির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আন্দোলন হয়। পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে ৩০ জন বিক্ষোভকারী শহিদের মৃত্যু বরণ করেন। এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে বিশ্বব্যাঙ্কের নির্দেশে সানচেজ সরকার সরকারি কর্মচারীদের বেতনহ্রাস, করবৃদ্ধি ও জনকল্যাণ খাতে বরাদ্দ হ্রাস করে। এর বিরুদ্ধে দেশজুড়ে প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু হয়। আন্দোলন ভাঙার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হলে পুলিশের নীচুতলার কর্মীরা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে রাজধানী লা পাজ-এ রাষ্ট্রপতি ভবন সপ্তাহকাল ধরে ঘেরাও করে রাখে। রাতের অন্ধকারে অ্যাম্বুলেন্সে চেপে পালিয়ে যান প্রেসিডেন্ট সানচেজ। এ আন্দোলনে ষাট জন প্রাণ দেন।

সেপ্টেম্বর মাসে যে আন্দোলন হল তাতে পূর্বেকার আন্দোলনের দাবিগুলি তো ছিলই, উপরন্তু আগুনে ঘৃতাহুতি হিসাবে কাজ করেছে জলের দামে আমেরিকাতে প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানির সরকারি সিদ্ধান্ত। ২৮ সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া আন্দোলন ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত চলে। প্রায় ১ মাসের এই আন্দোলনে ৮০ জন শহিদ হয়েছেন, ১৫০ জন গুরুতর আহত এবং দু হাজারের বেশি গ্রেপ্তার হয়েছেন। আন্দোলনের চাপে প্রেসিডেন্ট সানচেজ ইস্তফা দিয়ে দেশ থেকে পালিয়েছেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত ভাইস প্রেসিডেন্ট কার্লোস মেসা আমেরিকায় গ্যাস রপ্তানির সিদ্ধান্ত পুরোপুরি খারিজ করে না দিয়ে আগামী বছরের অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচন পর্যন্ত স্থগিত রেখেছেন। এইদিকে এম এ এস নেতা ইভো মোরালেস নেতৃত্বাধীন সংগ্রামী মঞ্চ হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে, গ্যাস রপ্তানির সিদ্ধান্ত ৯০ দিনের মধ্যে খারিজ না হলে তারা আবার লড়াইয়ে নামবে।

(সংবাদসূত্র ঃ ওয়ার্কাস ওয়ার্ল্ড (নিউ ইয়র্ক) ৩০ অক্টোবর এবং ফ্রন্টলাইন ২১ নভেম্বর ২০০৩)।

প্রমাণ ছাড়াই শাস্তির হুকুম

একের পাতার পর

আরও বললেন, "অনেক প্রত্যক্ষদর্শী আমাদের এও জানিয়েছেন যে, হামলাকারীরা আদপেই জুনিয়ার ডাক্তার ছিল কিনা, সে বিষয়ে তাদের সন্দেহ আছে।"

এই তদন্ত থেকে স্থানীয় সি পি এম কাউন্সিলর দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্দেহজনক ভূমিকা নিয়ে একটা প্রশ্ন কিন্তু উঠছেই। "এখন মনে হচ্ছে বণিকরা যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন, সেই ডাক্তারদের একজনেরও নাম বণিকরা জানতেন না", জানালেন আরেকজন অফিসার। তিনিই বললেন, 'গণ্ডগোলকারী'দের চিনিয়ে দিতে তাঁদের 'সাহায্য' করেন স্থানীয় সি পি এম কাউন্সিলার।"

একজন ডিভিশনাল অফিসার বললেন যে, এই এফ আই আর শেষপর্যন্ত "বিড়ম্বনার" কারণ হতে পারে।" "সাধারণত বিশদ অনুসন্ধানের পর কোন এফ আই আর যদি ভুয়ো প্রমাণিত হয় তবে আমরা তদন্ত বন্ধ করে দিয়ে থাকি।" কিন্তু "এই কেসটি যেহেতু রাজনৈতিক মাত্রা পেয়েছে, একমাত্র সে কারণেই আমরা সেটা করতে পারছি না।"

তিনি স্বীকার করেন যে, "থানা বা এমনকি ডিভিশন স্তরেও এই কেসের ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না।" তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী "ওপরওয়ালারা আমাদের যা করতে বলবেন, তার উপরই কেসটির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।"

(দি টেলিগ্রাফ (মেট্রো) পত্রিকায় সুনন্দ সরকার ও বাপ্পা মজুমদারের প্রতিবেদন, ১৩-১১-২০০৩)।

দলগাঁও চা-বাগানের হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে

জলপাইগুড়ি জেলার ফালাকাটা থানার অধীন দলগাঁও চা-বাগানে গত ৬ নভেম্বর ১৯ জনের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা সারা পশ্চিমবঙ্গেই আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে সি পি আই (এম)-এর শ্রমিক সংগঠন সিটু'র নেতা তারকেশ্বর লোহারের বাড়িতে। চা-বাগানে কর্মী-নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে তার কাছে কৈফিয়ৎ চাইতে এসেছিল একদল শ্রমিক — জনতা। সেই জনতাকে লক্ষ্য করে শ্রী লোহারের বাড়ি থেকে গুলি চালানো হয়। গুলিবিদ্ধ হয়ে একজন শ্রমিক লুটিয়ে পড়তেই জনতা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। শ্রী লোহারের বাড়িতে তখন জমায়েত হয়েই ছিল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত একটি বাহিনী। উত্তেজিত জনতা তাদের আক্রমণ করে, পরিণামে ঘরে অবরুদ্ধ লোহারের অনুগামীরা নিহত হন। অস্ত্রের আঘাতে ও ঘরে আগুন দেওয়াতে পুড়ে মরেন ১৯ জন। সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী নিহতদের সম্পর্কে পুলিশ যা বলে, তা হচ্ছে, এরা সকলেই দাগী আসামী। পুলিশের খাতায় এদের নাম আছে। শ্রীলোহার ও তার কিছু সঙ্গী পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যান। শ্রীলোহার পরে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রায় ২ হাজার শ্রমিকের এই বাগানটির একমাত্র ইউনিয়নটি সিটুরই দখলে। আক্রান্ত এবং আক্রমণকারীরা উভয়েই সিটুরই সমর্থক। সর্বপ্রথম দেখা যাক, এই ঘটনা সম্পর্কে সি পি আই (এম) নেতারা কি বলেছেন।

সি পি আই (এম) এর দ্বিচারিতা

ঘটনার পরের দিন ৭ নভেম্বর সি পি আই (এম) দলের মুখপত্র 'গণশক্তি' লিখেছে — "সি পি আই (এম)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক অনিল বিশ্বাস ঘটনার তীব্র নিন্দা করে এই নৃশংস ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তির দাবি জানান। পার্টির জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সম্পাদক মানিক সান্যাল এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করে বলেন, শুক্রবার জেলাজুড়ে এই ঘটনার বিরুদ্ধে ধিক্কার ও প্রতিবাদ দিবস পালিত হবে। ....নিহতদের অধিকাংশই ঐ চা-বাগানের কর্মী এবং সি আই টি ইউ ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত। এদিন সকালে ঐ চা-বাগানের ইউনিয়নের নেতা তারকেশ্বর লোহারের বাড়িতে ইউনিয়নের মিটিং-এর জন্য ২৫-৩০ জন কর্মী জড়ো হন। হঠাৎ স্থানীয় বেশ কিছু দুষ্কৃতী বোমা, পিস্তল নিয়ে লোহারের বাড়ি ঘিরে ফেলে। .....আক্রমণকারীরা মুহুর্মুহু বোমা ছুঁড়তে শুরু করে। বোমা নিক্ষেপ চলাকালীনই তারকেশ্বর লোহার কোনরকমে পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।"

কেন এই আক্রমণ? "অনিল বিশ্বাস এ বিষয়ে সাংবাদিকদের বলেন, ... সেখানে জুয়াখেলা, কাজের সময় মদ খাওয়া সহ নানারকম অসামাজিক কার্যকলাপ চলছিল। সি আই টি ইউ-র উদ্যোগে গত কয়েকমাস ধরে এর বিরুদ্ধে ধারাবাহিক প্রচার আন্দোলন সংগঠিত হয়।" এর ফলে সমাজবিরোধীরা ক্ষিপ্ত হয় এবং আক্রমণ সংগঠিত করে। এটা হল, ঘটনার পরের দিনই, সি পি আই (এম)-এর বক্তব্য।

অথচ দু'দিন বাদেই ১০ নভেম্বর 'গণশক্তি' লিখেছে যে, রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস তাঁদের দলের সঙ্গে তারকেশ্বর লোহারের সম্পর্ক অস্বীকার করেছেন — "গত বৃহস্পতিবারের ঘটনায় বিতর্কিত তারকেশ্বর লোহার পার্টির সঙ্গে যুক্ত কিনা সাংবাদিকরা জানতে চাইলে এদিন অনিল বিশ্বাস বলেন, লোহার পার্টির সাথে যুক্ত ছিল না।" অনিল বিশ্বাস বলেন, ঐ দিনের ঘটনায় যারা মারা গিয়েছে এবং যারা আক্রমণকারী ছিল তাদের মধ্যে আমাদের পার্টির সদস্য কেউ নেই।" পার্টির জেলা সম্পাদক মানিক সান্যালও বলেন, "গত বৃহস্পতিবারের ঘটনায় ধৃত তারকেশ্বর লোহার কোনদিনই পার্টির সদস্য ছিল না। অবাঞ্ছিত কার্যকলাপের জন্য দু-বছর আগেই চা-বাগান মজদুর ইউনিয়নের দলগাঁও শাখা থেকে তাকে বহিষ্কার করা হয়।"

৭ নভেম্বর সি পি আই (এম)-এর রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস তারকেশ্বর লোহারকে তাদের সিটু'র নেতা, ইউনিয়নের নেতা বলে বিবৃতি দিয়ে, ৩ দিন বাদে ১০ নভেম্বর তার সঙ্গে পার্টির সম্পর্ক অস্বীকার করলেনই শুধু নয়, তাদের দলেরই জেলা সম্পাদক মানিক সান্যাল এ কথাও জানালেন যে, শ্রীলোহার ২ বছর আগেই নাকি ইউনিয়ন থেকে বহিষ্কৃত। অথচ, তাঁদের পার্টিরই বীরপাড়া জোনাল কমিটির সম্পাদক রবীন রাই এ বক্তব্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে জানালেন যে, মানিকবাবুর কথা ঠিক নয়।

অনিল বিশ্বাস বললেন, আক্রান্তরাও তাঁদের পার্টির কেউ নয়। অথচ 'গণশক্তি' লিখেছে — "সন্ধ্যায় ১৯ জনের দগ্ধ শরীরগুলি গণকবর দেওয়া হয়। উপস্থিত আত্মীয় পরিজনকে সমবেদনা জানান পার্টির নেতা মণ্টু বসু, রবীন রাই, বুধুয়া লাকড়া, নরেশ রায়, সঞ্জয় মণ্ডল, কালু দে প্রমুখ। গণকবরের আগে দগ্ধ দেহগুলিকে ফুল দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান তাঁরা।" কবরের উপর উড়ছিল সি পি আই (এম)-এর দলীয় পতাকা, তার ছবি সহ বিবরণ একাধিক খবরের কাগজেও প্রকাশিত হয়েছে। এই হচ্ছে সি পি আই (এম)-এর দ্বিচারিতার নমুনা।

আর এস পি'র বয়ানে তারকেশ্বর লোহার

দলগাঁও চা-বাগানের সিটু নেতা তারকেশ্বর লোহার শুধু বাগানের ইউনিয়নের নেতা ছিলেন না। আশেপাশের ১০/১২টি বাগানের একজন কুখ্যাত মাফিয়া ছিলেন — একথা আর এস পি'র অভিজ্ঞতাতেও স্পষ্ট। "আর এস পি নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী মনোহর তিরকি বললেন, ৭ জুলাই পাশের বীরপাড়া চা-বাগানে আমাদের স্থানীয় নেতা বিষ্ণু বারা খুন হন। পুলিশকে বারবার বলেছি, এই খুনের পাণ্ডা তারকেশ্বর। কিন্তু ওকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। আর এস পি বিধায়ক নির্মল দাস বললেন, জুলাই মাসে আলিপুরদুয়ারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের হাতে আমাদের ১২ জন কর্মীর খুনের তালিকা তুলে দিই। লিখিতভাবে জানিয়েছিলাম, খুনের পাণ্ডা তারকেশ্বর লোহার। মন্ত্রী দশরথ তিরকি, সাংসদ জোয়াকিম বাকলা আজ দলগাঁও যান। গতকাল মর্মান্তিক ঘটনার পরে তারকেশ্বরের বাড়িতে দেখা যায় অনেকগুলি মদের বোতল, কুয়োর পাড়ে চাপ-চাপ রক্তের উপরেও একটি বোতল। বিধায়ক নির্মল দাস বলেছেন, দমদমের দুলাল ব্যানার্জীর বীরপাড়া সংস্করণ হয়ে উঠেছিল তারকেশ্বর।" (আজকাল, ৮ নভেম্বর)

"জলপাইগুড়ি জেলা সি পি আই (এম)-এর মদতেই দলগাঁও চা-বাগানে তারকেশ্বর লোহারের এত বাড়বাড়ন্ত হয়েছে বলে অভিযোগ করল আর এস পি। দলের শ্রমিক সংগঠন ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক ঘোষ শনিবার বলেন, সি পি এমের জেলা সম্পাদক মানিক সান্যাল আজ বলেছেন, তারকেশ্বরকে আগেই সিটু থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদি তাই হয়, সে বাগানে এত প্রভাবশালী হয় কি করে? গত ২০ বছর ধরে সে বাগানে তাণ্ডব চালাচ্ছে। সি পি এম নেতাদের প্রত্যক্ষ মদত না থাকলে এ জিনিষ হতে পারে না। আর এস পি'র শ্রমিক নেতা বলেন, শুধু দলগাঁও নয়, উত্তরবঙ্গের একাধিক চা-বাগানে তারকেশ্বরের মতো লোকেরা সক্রিয়। আমরা বহুবার জেলা বামফ্রন্টের বৈঠকে এসব প্রসঙ্গ তুলেছি। কিন্তু কোনও ফল হয়নি।" (বর্তমান, ৯ নভেম্বর)

"শুক্রবার জলপাইগুড়ি আর এস পি'র এক বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা সাংবাদিকদের বলেছেন, 'বেশ কয়েক বছর আগে এই তারকেশ্বর লোহারের বাহিনী সি পি আই(এম) ছেড়ে আর এস পিতে যোগ দেওয়া কয়েকজন শ্রমিক কর্মীকে ধরে নিয়ে গিয়ে খুন করেছিল এবং তারপর তাদের দুই জনের মুণ্ডু কেটে চা-বাগানেরই একটা অঞ্চলে টাঙিয়ে দিয়েছিল। বিদ্রোহীদের দু'জনের কাটা মুণ্ডু দেখিয়ে তারকেশ্বর লোহারের বাহিনী নাকি এলাকার সব চা-বাগান শ্রমিককে বলতে চেয়েছিল, 'দেখ, আমাদের বিরুদ্ধে যে যাবে, অন্য দলে যে ঢোকার চেষ্টা করবে, তার হাল আমরা এরকম করব।'.....আর এস পি'র অভিযোগ, পুলিশ তাকে এখনও কিছু বলেনি। তার বিরুদ্ধে যত অভিযোগ উঠেছে পুলিশ কখনো কোন ব্যবস্থা নেয়নি। এমনকি, তার বাহিনী এলাকায় বেশ কিছু খুনের ঘটনায় জড়িত হলেও পুলিশ কখনও তাদের গায়ে হাত দেয়নি।' আর এস পি নেতারা এখন অভিযোগ করছেন, জেলা সি পি এম নেতৃত্ব বারবার তাদের বলেছিলেন, তারকেশ্বর ভালো লোক। সে আমাদের একজন বিশ্বস্ত ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, সে কখনও কোনও খারাপ কাজে জড়িত থাকে না!" (বর্তমান, ৯ নভেম্বর)

এর সাথে তারকেশ্বর লোহারের বর্তমান জীবনশৈলী যুক্ত করে পত্রিকা লিখেছে — "বাগানে ফ্যাক্টরি লাইনে তারকেশ্বরের কোয়ার্টার। বাগানের সব শ্রমিক কোয়ার্টারই ঘুপচি। তারকেশ্বর নিজের এমন কোয়ার্টারের সামনে বানিয়ে নিয়েছে সুন্দর বাড়ি। রঙীন টিভি, ফ্রিজ, নিজস্ব ডিস এন্টেনা, আধুনিক বিলাসবহুল জীবনযাপনের সব কিছুই বাড়িতে মজুত। দু'টি মোটর সাইকেল, একটি মারুতি গাড়ি। বীরপাড়া রেল স্টেশনের কাছে এবং সুভাষপল্লীতে দু'টি বাড়ি। ....কর্মী নিয়োগের অধিকার ও দায় কর্তৃপক্ষের। কিন্তু সে অধিকারও চলে এসেছে তারকেশ্বরের হাতের মুঠোয়। বাগানের বেকার যুবকরা বলেছেন, বাইরের যে তিনজনকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে, তাদের থেকে মোটা টাকা নিয়েছে তারকেশ্বর। ....জেলা পুলিশ সুপার সিদ্ধিনাথ গুপ্তা বললেন, প্রাথমিক তদন্তেই বাঁকা পথে ওর অর্থ উপার্জনের বহু তথ্য আমরা পেয়েছি। গত ১২ বছরের সব রেকর্ড আমরা খতিয়ে দেখা শুরু করেছি।" (আজকাল ৮ নভেম্বর)

ফলে আর এস পি'র অভিজ্ঞতা থেকেও এটা স্পষ্ট যে, সিটু নেতা তারকেশ্বর লোহার এলাকার দীর্ঘদিনের দুর্নীতিগ্রস্ত এক মাফিয়া নেতা। সি পি এম তাকে ব্যবহার করেছে অপর দলের কার্যকলাপের মূল উচ্ছেদ করে নিজের দলের প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে। বলাবাহুল্য, সি পি এমের মালিকতোষণ নীতির জন্য বাগান-মালিকপক্ষের আশীর্বাদও এই তারকেশ্বর লোহারের উপর বর্ষিত হয়েছে। মালিকরা তাকে ব্যবহার করেছে শ্রমিকদের দাবিয়ে রাখতেই। মালিকরা তাদের ঘ্রাণশক্তি থেকে এটাও বুঝেছে যে, এই ধরনের দল এবং শ্রমিকনেতাই তাদের দরকার। তাই মালিকদের মদতে কোনো ঘাটতি ছিল না।

এই দ্বিচারিতার উৎস

একই ইউনিয়নভুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী ও অত্যন্ত বেদনাদায়ক এইসব সংঘর্ষের ঘটনা এই প্রথম নয়। এর আগেও রেডব্যাঙ্ক চা-বাগান সহ অন্যান্য কিছু চা-বাগানে সিটু'র মতো প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়নের শ্রমিক-কর্মচারীরা ভ্রাতৃঘাতী লড়াইতে নিজেদের শক্তি ক্ষয় করেছে — মালিকপক্ষ দূরে দাঁড়িয়ে দেখেছে আর হেসেছে। এসবের উৎস কি — একটু গভীরে ভেবে দেখা দরকার। বিশেষ করে, এখন যখন সারা উত্তরবঙ্গ জুড়েই বহু চা-বাগানে লকআউট চলছে, বাগান পরিত্যাগ করে মালিক পালিয়ে গিয়েছেন, হাজার হাজার শ্রমিক বেকারত্বের জ্বালায় জ্বলছেন, মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছেন, বাস্তবে চলছে শ্রমিক-মৃত্যুর মিছিল, তখন শ্রমিকদের মধ্যে এই ধরনের ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষ কার স্বার্থ রক্ষা করছে, ভেবে দেখা দরকার। উত্তরবঙ্গের চা-বাগানে একসময় মূলত আই এন টি ইউ সি এবং আর এস পি প্রভাবিত ইউ টি ইউ সি ইউনিয়নেরই প্রাধান্য ছিল। কিন্তু সরকারী ক্ষমতার মদতে, পুলিশ-প্রশাসনকে কুক্ষিগত করে এবং মালিকশ্রেণীকে অভয়বার্তা শুনিয়ে সি পি এম প্রভাবিত সিটু ইউনিয়নগুলি বাগানে বাগানে গড়ে উঠতে থাকে, সিটু'র শক্তিবৃদ্ধি ঘটে।

কিন্তু সিটু'র এই শক্তিবৃদ্ধি কি আদৌ শ্রমিক-সচেতনতার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে? আদৌ তা নয়, তাদের শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছে খুন ও সন্ত্রাসের জোরে, পুলিশ-প্রশাসনের মদতে এবং সর্বোপরি মালিকপক্ষের অকৃপণ সহযোগিতায়। দলগাঁও চা-বাগানে সিটু ও তার নেতা তারকেশ্বর লোহারের উত্থান এর জাজ্বল্যমান উদাহরণ। আশির দশকে সেখানকার অন্য একটি বামপন্থী দল আর এস পি'র প্রভাবিত ইউনিয়ন ভেঙে সিটু ইউনিয়ন শক্তিশালী হতে থাকে। লক্ষণীয় আর এস পি দলটি, বামফ্রন্টের শরিক। এই শক্তিবৃদ্ধির পথে তারকেশ্বর লোহার মূল মাফিয়া ডন হিসেবে কাজ করেছে। মালিকপক্ষ বামফ্রন্ট সরকারের ছোট শরিক আর এস পি'র চেয়ে বড় শরিক সি পি আই এমকে বেশি পছন্দ করেছে খুবই স্বাভাবিক কারণে। তাই তাদের মদত মিলেছে। তাই খবরের কাগজেও রিপোর্ট বেরিয়েছে, তোলা তোলা, চাকরি দেওয়া থেকে শুরু করে সব ব্যাপারেই মালিকপক্ষ লোহার ও সিটুকেই অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছে।

এইভাবে বেশিরভাগ শ্রমিকদের উপর আধিপত্য কায়েম হবার পর সাফল্যের আনন্দ উপলব্ধি করেছে সিটু। কিন্তু শ্রমিকদের মৌলিক দাবি, অভাব অভিযোগগুলো নিয়ে মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে সত্যিকারের লড়াই পরিচালনা করার শক্তি সিটু হারিয়েছে। মালিকপক্ষের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে ছলে-বলে-কৌশলে এবং গায়ের জোরে শ্রমিকদের ওপর একাধিপত্য কায়েম করাই যাদের উদ্দেশ্য, তারা কখনই শ্রমিকদের জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে মালিকের বিরুদ্ধে যথার্থ সংগ্রাম গড়ে তুলতে পারে না। ফলে এই বিপথে পরিচালিত শ্রমিক নেতৃত্ব মালিক-শ্রমিকের মধ্যে একটা বড়জোর আপোষকামী শক্তি হিসাবে কাজ করতে থাকে। সিটু'র নেতৃত্বে চা-বাগানে তা-ই ঘটে চলেছে।

কিন্তু পেটের বালাই বড় বালাই। এতে শ্রমিকদের ভুখা পেটের জ্বালা কমে না, বাগানের ছেলেমেয়েদের বেকারত্বের জ্বালা মেটে না। তার

সাতের পাতায় দেখুন

ইরাক থেকে মার্কিন সেনা অপসারণের দাবিতে বিশাল কনভেনশন

একের পাতার পর

হিসাবে দাঁড়িয়ে গেল, অর্থাৎ, যুদ্ধের শক্তি বাড়ল ও শান্তির শক্তি কমল, তখনই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, বিশেষত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবিরোধী জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলার গুরুত্ব ও প্রয়োজন অনভূত হয়েছিল এবং বিশ্বে প্রথম এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল এস ইউ সি আই। ১৯৯৫ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রথম কনভেনশন। বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের প্রতিনিধিরা ঐ কনভেনশনে যোগ দেন — যার ঘোষণাপত্র বিশ্বে পরিচিত হয়েছিল 'ক্যালকাটা ইনিসিয়েটিভ' নামে। এরপর যত দিন গিয়েছে, ততই যুদ্ধের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জঙ্গি শান্তি আন্দোলন গড়ে তোলার আশু প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে।

'ইরাক থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার', 'আমেরিকার মদতে প্যালেস্টাইনের ওপর ইস্রায়েলী হামলা বন্ধ' এবং 'আমেরিকার চাপের কাছে নতি স্বীকার করে ইরাকে ভারতীয় সেনা পাঠানো চলবেনা' এইসব দাবিতে গোটা দেশজুড়ে প্রচার চালায় রাজ্যে রাজ্যে গঠিত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফোরামগুলি। সাথে সাথে চলে প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থসংগ্রহ ও প্রতিনিধি সংগ্রহের কাজ। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দীর্ঘ এবং গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের অধিকারী জনসাধারণ ফোরামের এই উদ্যোগে আন্তরিক-ভাবে সাহায্য ও সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

১৫ নভেম্বর কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে সকাল ৯টায় কনভেনশনের শুরুতে সভাপতি হিসাবে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য, সারা ভারত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফোরামের সম্পাদক ডঃ সুশীল মুখার্জীর নাম প্রস্তাব করেন ফোরামের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি মুখার্জী এবং তা সমর্থন করেন ফোরামের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সম্পাদক অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর ঘটক। শহীদবেদীতে ডঃ সুশীলকুমার মুখার্জীর মাল্যদানের মধ্য দিয়ে কনভেনশনের কাজ শুরু হয়। সারা ভারত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফোরামের সভাপতি বিচারপতি কৃষ্ণ আয়ার অসুস্থতার কারণে উপস্থিত থাকতে না পেরে, একটি বার্তা পাঠান। বার্তাটি পড়ে শোনান সারা ভারত ফোরামের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য শ্রী ভেনুগোপাল। শ্রী আয়ার তাঁর প্রেরিত বার্তায় বলেন, আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের হুমকির সামনে আজ আর কোন দেশই প্রকৃত অর্থে মুক্ত নয়। একদিন মার্কিন আক্রমণে ভিয়েতনাম বিধ্বস্ত হয়েছিল, আক্রান্ত হয়েছে আফগানিস্তান, তার সার্বভৌমত্ব আমেরিকা কেড়ে নিয়েছে, বুশ এবং পেন্টাগনের মিলিটারি আক্রমণে পতন হয়েছে ইরাকের সাদ্দাম হোসেন নেতৃত্বাধীন সরকারের। কিউবাতে ইতিমধ্যেই জারি হয়েছে নিষেধাজ্ঞা এবং চলছে ক্রমাগত হুমকি। রাষ্ট্রসংঘকে নস্যাৎ করে আমেরিকা যে সন্ত্রাস চালাচ্ছে, তার সামনে বিশ্বব্যাপী মানুষ আজ আতঙ্কিত। এতদ্‌সত্ত্বেও ইরাকের সংগ্রামী জনগণ তাঁদের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। এই লড়াইয়ে তাদের পাশে আমাদের থাকতেই হবে।

কনভেনশনের সভাপতি ডঃ সুশীল মুখার্জী বলেন, প্রথমেই আমি ইরাক থেকে অবিলম্বে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি। তিনি বলেন, মারণাস্ত্র আছে বলে সাদ্দামকে মিথ্যা দোষারোপ করেছিল আমেরিকা। রাষ্ট্রসংঘের

ডঃ সুশীল মুখার্জী

পরীক্ষক দলও সেখানে কোন অস্ত্রের সন্ধান পায়নি। তা সত্ত্বেও আমেরিকা ইরাকে শক্তিশালী বোমা দিয়ে দেশের হাজার হাজার নারী, শিশু সাধারণ মানুষকে হত্যা করেছে। হাসপাতাল, স্কুল, শিল্পকেন্দ্র, বিদ্যুৎব্যবস্থা ধ্বংস করেছে। প্রাচীন সভ্যতার মূল্যবান নিদর্শনগুলিকে ধ্বংস করেছে, লুট করেছে, কিন্তু অক্ষত রেখেছে তৈলখনিগুলি। এর থেকে বোঝা যায়, অস্ত্র খোঁজা আমেরিকার উদ্দেশ্য ছিল না, মূল উদ্দেশ্য ছিল, ইরাক দখল করে তার তেলসম্পদ লুট করা। তিনি বলেন, এটা আশার কথা যে, গোটা ইরাক জুড়ে সাধারণ মানুষের প্রতিরোধ তীব্রতর হয়েছে। আমেরিকান জেনারেল স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, সাধারণ মানুষের ব্যাপক সমর্থনই গেরিলাদের শক্তি। আমরা একমত যে, সাম্রাজ্যবাদী শত্রু যত শক্তিশালীই হোক না কেন, ঐক্যবদ্ধ জনগণের শক্তি তার থেকেও বেশি।

সারা ভারত ফোরামের সহ-সভাপতি মানিক মুখার্জী প্রতিনিধিদের সামনে কনভেনশনের 'অ্যাপ্রোচ পেপার'টি উপস্থিত করেন। এতে বলা হয়, এই মুহূর্তে ইরাক পরিণত হয়েছে একদিকে বিশ্বব্যাপী আধিপত্যবাদী মার্কিন বাহিনী এবং অপরদিকে বিশ্বের স্বাধীনতাপ্রেমী, শান্তিকামী, ন্যায়কামী শক্তি, বিশেষত ইরাকী জনগণের বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের কেন্দ্রে। এই কনভেনশন ইরাকি জনগণের এই প্রতিরোধ সংগ্রামকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। 'অ্যাপ্রোচ

মানিক মুখার্জী

পেপারে' আরও বলা হয়, সাধারণভাবে বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতির সংকট, বিশেষত মার্কিন জাতীয় অর্থনীতির অভূতপূর্ব সঙ্কটের হাত থেকে উদ্ধার পেতে এবং তথাকথিত বিশ্ববাজারে আধিপত্য কায়েমের উদ্দেশ্যেই আমেরিকা এই যুদ্ধ পরিকল্পনা করে চলেছে। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনুপস্থিতিই আমেরিকাকে এই একতরফা সুযোগ করে দিয়েছে। মারণাস্ত্র উৎপাদন মার্কিন অর্থনীতির টিকে থাকার একটি আবশ্যিক শর্তে পরিণত হয়েছে। ফলে, জমা অস্ত্র খালাস করার জন্য স্থানীয় এবং আংশিক যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদের কাছে অবশ্যপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। বিশ্বায়নকে প্রগতির এক নতুন স্তর হিসাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, এ নাকি বাজার নিয়ে সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাবে এবং উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় দেশেরই অব্যাহত উন্নয়নের দরজা খুলে দেবে। সাম্রাজ্যবাদের এই বিশ্বায়ন তত্ত্বের অসারতা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন বাস্তবে দেশে দেশে দারিদ্র্য বাড়িয়েছে। বাজার নিয়ে যে দ্বন্দ্বের অবসান ঘটবে বলে তারা প্রচার করেছিল, বাস্তবে সেই দ্বন্দ্ব আরও তীব্র হয়েছে। ইরাক প্রশ্নে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত প্রমাণ করল যে, সাম্রাজ্যবাদীদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব তীব্র হচ্ছে, যা কালক্রমে সশস্ত্র যুদ্ধের রূপে ফেটে পড়তে পারে।

মার্কিন প্রবল সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে কীসের জোরে ইরাকি জনগণ প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলতে সক্ষম হলো, তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 'অ্যাপ্রোচ পেপারে' তিনটি কারণের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত, রাষ্ট্রসংঘের নামে দীর্ঘ মার্কিন অবরোধের পরিণামে প্রবল দুর্দশা ও বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে মাথা নত না করার মধ্য দিয়ে গড়ে-ওঠা ইরাকি জনগণের সুগভীর দেশপ্রেম; দ্বিতীয়ত, শিয়া, সুন্নিসহ সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়কে জড়িত করে গড়ে-ওঠা জনসাধারণের ধর্মনিরপেক্ষ ঐক্য; এবং তৃতীয়ত, ইরাকি জনগণের এই সংগ্রামে বিশ্বব্যাপী সাধারণ মানুষের বিপুল সমর্থন। ইরাকের প্রশ্নে ভারত সরকারের ভূমিকাকে আমেরিকার কাছে খোলাখুলি আত্মসমর্পণ বলে বর্ণনা করে বলা হয়েছে, ভারত সরকার যখন ক্রমাগত মার্কিন ঘেঁষা নীতি নিয়ে চলছে এবং উভয় দেশের স্বার্থের যথেষ্ট মিল দেখা যাচ্ছে, তখন মাঝে মাঝে নিরপেক্ষতার ভান আসলে দেশপ্রেমী জনসাধারণের আবেগকে বিভ্রান্ত করার কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়। 'অ্যাপ্রোচ পেপারে' আরও বলা হয়েছে, এই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামকে জঙ্গি শান্তি আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে হবে, যা শান্তিবাদী (pacifist) আন্দোলন থেকে সমস্ত দিক থেকেই সম্পূর্ণ পৃথক।

দেশে দেশে মার্কিন শাসকদের সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনের প্রতিবাদে আমেরিকার বুক থেকেই প্রতিবাদ সংগঠিত করা, আন্দোলন সংগঠিত করার শপথ নিয়ে খোদ আমেরিকাতেই গড়ে উঠেছে 'ইণ্টারন্যাশনাল অ্যাকশন সেণ্টার।' এই সংগঠনের প্রতিনিধিরূপে এবার কনভেনশনে এসেছিলেন হিদার কোটিন জারভেসি। তিনি কনভেনশনে বলেন, এই বিশাল সমাবেশে বলার সুযোগ পেয়ে সম্মানিত বোধ করছি। বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের প্রতি দায়বদ্ধ সৈনিকদের এই সমাবেশে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ার জন্য সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেণ্টার অফ ইণ্ডিয়াকে আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সাম্রাজ্যবাদ আজ মানবসভ্যতার সামনে সবচেয়ে বড় বিপদ হিসাবে দেখা দিয়েছে। এবং আমেরিকা সবচেয়ে শক্তিশালী পুঁজিবাদ হিসাবে মানবসভ্যতার

হিদার কোটিন জারভেসি

সবচেয়ে বড় শত্রু। এই সাম্রাজ্যবাদী দানব দেশটি, যেখান থেকে আমি এসেছি, অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশগুলির সাথে যোগসাজসে গোটা বিশ্বকে আপন থাবার মধ্যে আনতে চাইছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ সর্বত্রই এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। ইরাক এবং প্যালেস্টাইনে গণপ্রতিরোধ প্রবল আকারে দেখা দিয়েছে। আমেরিকান গোলার্ধেই সবচেয়ে বেশি প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে উঠছে। বলিভিয়া, কিউবা, কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা, ব্রাজিল সহ সর্বত্রই মানুষ জেগে উঠেছে এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হচ্ছে।

প্যালেস্টাইনের প্রতিরোধে ইস্রায়েলিদের নিহত হওয়ার খবর প্রচার করে ইস্রায়েলি শাসকরা কিছু মানুষের সমর্থন টানতে পারলেও বাকি জনগণ প্যালেস্টাইনের সাহসী সংগ্রামকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। প্যালেস্টাইন বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে ইস্রায়েলের কবর খুঁড়ছে। প্যালেস্টিনীয়দের গণসংগ্রাম (ইন্তিফাদা) ইরাকিদেরও অনুপ্রেরণা দিয়েছে। প্যালেস্টাইন ছাত্র-যুবরা যদি পাথর হাতে বিশ্বের দ্বিতীয় মিলিটারি শক্তিধর ইজরায়েলের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে পারে, তবে বন্দুক, রকেট, লঞ্চার নিয়ে ইরাকিরা কেন তা পারবেনা।

প্রতিবেশী বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের প্রতিনিধি হিসাবে

খালেকুজ্জামান

এসেছিলেন, খালেকুজ্জামান ও মবিনুল হায়দার চৌধুরী। খালেকুজ্জামান বলেন, বিশ্বব্যাপী

পাঁচের পাতায় দেখুন

প্যালেস্টাইন জনগণের উপর ইজরায়েলি হানাদারি বন্ধের দাবিতে কনভেনশন

চারের পাতার পর

মানুষের চোখ থেকে কালো পর্দাটা সরে গিয়েছে। বিশ্বের মানুষ আজ পরিষ্কার বুঝতে পারছে, মানবসভ্যতার পক্ষে মার্কিন-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কত মারাত্মক — তা সে সভ্যতার যত বড়াই করুক না কেন! আমেরিকা-ব্রিটেন সহ বিশ্বজনমত আজ যুদ্ধের বিরুদ্ধে। ১৩ বছরের মার্কিন অবরোধে এবং দু-মাসের অসম যুদ্ধে তাদের হাতে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর পর তাদের মুখে মানবাধিকারের কথা হাস্যকর শোনায় না কি! তিনি বলেন, সাদ্দাম হোসেন কখনই সন্ত্রাসবাদী বা মৌলবাদী শক্তিগুলির সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে নি। মধ্যপূর্ব এশিয়ায় ইরাকই হল একমাত্র রাষ্ট্র, যে নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ বলে ঘোষণা করেছিল।

ফ্রান্স থেকে আগত ডিমোক্রিট পত্রিকার সম্পাদক, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের সংগঠক, আলেকজাণ্ডার মুম্বারিস বলেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পতনের পর আমেরিকা একতরফা আধিপত্য চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, ইরাক একটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃত সার্বভৌম দেশ হওয়া সত্ত্বেও যেভাবে তার উপর আক্রমণ হল, তাতে আন্তর্জাতিক আইন বলে আর কিছু থাকল না।

তিনি বলেন, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে গতকালের শত্রু আজ সাময়িকভাবে হলেও মিত্রতে, আবার মিত্ররা শত্রুতে পরিণত হতে পারে। এ ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক হওয়া দরকার। মার্কিন যুদ্ধচক্রান্ত সম্পর্কে তিনি বলেন, ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা আমেরিকার এতটাই প্রয়োজন ছিল যে, এমন একটি ঘটনা সে নিজেও তৈরি

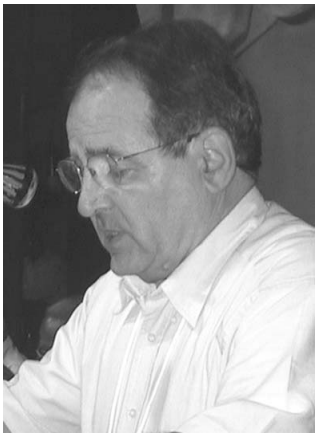

আলেকজাণ্ডার মুম্বারিস

করে নিতে পারে এবং বাস্তবেও ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেণ্টারে হামলা মার্কিন শাসকদের ষড়যন্ত্রেরই ফল।

সিরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর সদস্য নাফে বুজান বলেন, অত্যন্ত দুঃখের সাথে আমরা দেখছি, উপনিবেশবাদ তার কুৎসিত রূপ নিয়ে আবার ফিরে আসছে। মার্কিন-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে মিথ্যা অজুহাতে দুই মূল লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তারা একদিকে মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্রটাকেই নিজেদের সুবিধামত বদলে নিতে চাইছে। অপরদিকে ইরাকের তেলভাণ্ডার দখলের লক্ষ্যেই ইরাক দখল করেছে। তিনি বলেন, সিরিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি বিশ্বের দেশে দেশে প্রতিবাদী

নাফে বুজান

মানুষের সাথে গলা মিলিয়ে ইরাক আক্রমণের নিন্দা করেছে। তিনি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী ফ্রন্ট গড়ে তুলতে সকলকে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

প্যালেস্টাইনের প্রতিনিধি আহমেদ জামুল বলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর বিশ্বব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। অথচ মার্কিন 'চিন্তাবিদরা' কীভাবে মিলিটারি ব্যয় কমানো যায় তা ভাবার পরিবর্তে কীভাবে নতুন শত্রু তৈরি করা যায়, সেকথাই ভেবে চলেছে। এজন্য তারা সভ্যতার সংঘর্ষের তত্ত্ব আবিষ্কার করল এবং ইসলামিক দুনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করল — যে যুদ্ধ আসলে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে আরবের পেট্রল কবজা করে গোটা দুনিয়ায় আধিপত্য কায়েমের জন্য যুদ্ধ। আরব এলাকায়

আহমেদ জামুল

মার্কিনদের সর্বশেষ চক্রান্ত হল, 'রোডম্যাপ' পরিকল্পনার নামে আরব এলাকা দখল করা এবং আরব জনগণকে মার্কিন আধিপত্য স্বীকারে বাধ্য করা; মধ্যপ্রাচ্য দখলে আরবদের মার্কিন অংশীদারে পরিণত, করা যা আসলে মার্কিন দাসত্ব ছাড়া কিছুই নয়। তিনি বলেন, আমাদের সংগ্রাম হচ্ছে অনৈতিক এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে নৈতিকতার ভিত্তিতে গড়ে-তোলা প্রতিরোধ।

বিদেশ থেকে আগত প্রতিনিধিদের পর ভারতের ২০টি রাজ্য থেকে আগত বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিনিধিরা ১৫ নভেম্বরের দ্বিতীয় অধিবেশন থেকে ১৬ নভেম্বরের দু'টি অধিবেশনেই বক্তব্য রাখেন।

মহারাষ্ট্র থেকে আগত মুম্বাই হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এস এন দাউদ বলেন, আমি আমেরিকা অনুরাগী, কিন্তু সে আমেরিকা বুশের আমেরিকা নয়, সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা নয় — মার্ক টোয়েনের আমেরিকা, লিঙ্কনের আমেরিকা। আজ আমেরিকা একের পর এক দেশে হামলা চালাচ্ছে, ধ্বংস করছে, দখল করছে। আর এ সবই সে করছে সভ্যতার নামে। শুধু আজ নয়, আমেরিকা কোনদিনই বিশ্বে শান্তি চায়নি। তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই হচ্ছে লুট। ইরাককে ধ্বংস করে, তা নির্মাণ করার বরাত দেওয়া হয়েছে বিরাট বিরাট মার্কিন কোম্পানিকে। তিনি বলেন, আজ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অভ্যন্তরেই এই দখলদারির বিরুদ্ধে মানুষ প্রতিবাদে সোচ্চার হচ্ছে। ইরাক আক্রমণের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বৃহৎ গণবিক্ষোভ হয়েছে আমেরিকাতেই। ব্রিটেনেও হয়েছে দ্বিতীয় বৃহত্তম সমাবেশ। পুঁজিবাদ কখনই টিকে থাকবে না, তার ধ্বংস হবেই।

ফোরামের কেরালা শাখার সভাপতি, কেরালা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ এন এ করিম বলেন, মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে আমেরিকা যে সমস্যার সৃষ্টি করেছে তা আজ আর শুধু সেখানেই সীমাবদ্ধ নেই, সারা বিশ্বের সমস্যায় পরিণত হয়েছে। বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাসবাদের কথা বলা হচ্ছে। কারা সন্ত্রাসবাদী? আমেরিকা বিশ্বের সেরা সন্ত্রাসবাদী নয় কি? আফগানিস্তানকে ধ্বংস করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে। ইরাকে কারপেট বোম্বিং করে, গণহত্যা চালিয়ে, অবরোধ জারি করে কয়েক লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে। ইউফ্রেটিস নদীর তীরে যে সুপ্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। এ সবই তারা করেছে 'অপারেশন ইরাকি ফ্রিডম' নাম দিয়ে। কার স্বাধীনতার কথা তারা বলছে? সে কি ইরাকিদের, নাকি ইরাকের জনগণকে শোষণ করার একচ্ছত্র অধিকারে তাদের স্বাধীনতা? তিনি বলেন, আজ আমাদের স্থির করতে হবে, কীভাবে আমরা এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করব। আমার বিশ্বাস, কনভেনশন তা স্থির করতে সক্ষম হবে।

গুজরাটে সাম্রাজ্যবাদ, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এবং গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে প্রথম সারির যোদ্ধা কিরীটভাই ভাট বলেন, ইরাকে সাম্রাজ্যবাদী দখলদারির বিরুদ্ধে আমরা ফোরামের গুজরাট শাখার পক্ষ থেকে অসংখ্য বিক্ষোভ সমাবেশ, পথসভা, পথ নাটিকা এবং লিফলেট প্রচার করেছি। সংখ্যায় হয়তো আমরা বেশি ছিলাম না, তবু আমরা প্রতিবাদ করেছি। আমাদের হাতে অস্ত্র বলতে এটাই আছে এবং জনগণের এই প্রতিবাদের শক্তি কম নয়।

কর্ণাটকের অধ্যাপক রবি ভার্মা কুমার বলেন, আমেরিকা আজ তেলের জন্য ইরাক দখল করেছে, কাল সিরিয়া দখল করবে। আমরা যদি চুপচাপ থাকি, প্রতিবাদ না করি, তবে পরের দিন ভারতও আক্রান্ত হতে পারে। আমরা প্রতিবাদ করছি ভারতীয় বলে নয়, মানুষ বলে। 'অ্যাপ্রোচ পেপারে' জনসাধারণের যে ধর্মনিরপেক্ষ ঐক্যের কথা বলা হয়েছে, ভারতেও যদি সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকে রুখতে হয়, ধর্ম-বর্ণে ভেদাভেদ, বৈষম্য দূর করে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। স্বাধীনতার ৫৬ বছর পরেও অস্পৃশ্যতা দূর হল না; এখনও বিরাট সংখ্যক মানুষ কুঁড়েঘরে বাস করে, এগুলিকেও আমাদের সংগ্রামের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক

আটের পাতায় দেখুন

বার্তা ইরাক থেকে

ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি অফ ইরাক

প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ,

আমাদের ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত এক ভাইয়ের মাধ্যমে আপনাদের কনভেনশন সম্পর্কে জানতে পেরে সম্মানিত বোধ করেছি। আজ যখন সারা দুনিয়া জুড়ে সাম্রাজ্যবাদী ও জিয়নিস্টরা রক্তাক্ত আগ্রাসন চালাচ্ছে, সে সময়ে আপনাদের এই কনভেনশন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ফলে, সাম্রাজ্যবাদ ও ইহুদিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মহান নৈতিকতা থেকে আপনাদের কনভেনশনকে উষ্ণতম, জঙ্গি ও ভ্রাতৃপ্রতিম অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি ইরাককে যে নোংরা বর্বর সাম্রাজ্যবাদীরা দখল করে রেখেছে এবং তাদের যারা ঘৃণ্য সহযোগী, তাদের তাক্ করে ছোঁড়া রাইফেলের পবিত্র বুলেট দিয়ে আপনাদের কনভেনশনকে আমরা সেলাম জানাচ্ছি।

ইরাকি জনগণের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সংগ্রাম এখন আঞ্চলিক ও জাতীয় উভয় স্তরেই গড়ে উঠেছে। এর ফলে ইরাকের মাটি প্রতিদিন রূপান্তরিত হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী ও তার দালালদের কবরস্থানে। ইরাকিদের সংগ্রাম, রক্ত ঢেলে, শহীদদের আত্মদানের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করছে যে, আমাদের মাতৃভূমি যতদিন না আবার মুক্ত হচ্ছে, ততদিন সাম্রাজ্যবাদী দখলদারদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম চলবে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী মতদপুষ্ট জিয়নিস্ট দখলদারির বিরুদ্ধে প্যালেস্টাইনে আমাদের বীর ভাইরা যে দীর্ঘ লড়াই চালাচ্ছে, তার সাথী হিসেবেই আমাদের লড়াই গড়ে উঠেছে ও এগিয়ে যাচ্ছে। ফলে, আরব জাতির, তার শক্তি ও গৌরবের পুনর্জন্ম ঘটানোই হচ্ছে আমাদের সংগ্রামের মূল ভিত্তি, যার অর্থ হচ্ছে সকল ধরনের সাম্রাজ্যবাদ ও ইহুদিবাদকে আমরা আরব ভূখণ্ড থেকে মুছে দেব। আমরা আরব মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে সুদৃঢ়ভাবে আপনাদের পাশে আছি। বিশ্বের যেখানে যারাই সাম্রাজ্যবাদ ও ইহুদিবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য লড়ছে, তাদের সকলের সাথেই আমরা সংহতিবোধ করি।

আপনাদের প্রতি আবেদন, এই কনভেনশন যেন ইরাকি-আরব জনগণের প্রতি সংহতিকে আরও দৃঢ় করতে সাহায্য করে। সাথে সাথে, বীর প্যালেস্টিনীয় প্রতিরোধ সংগ্রামী আবু আল আববাস ও তারিক আজিজ সহ ইরাকের সকল রাজনৈতিক বন্দীর ইয়াংকি অত্যাচারের অন্ধকূপ থেকে নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে প্রচার অভিযান শুরু করার জন্য আপনাদের অনুরোধ জানাব।

ইরাকি, প্যালেস্টিনিয় ও আরব মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের সেলাম।

আন্তর্জাতিক সংহতি জিন্দাবাদ।

সাম্রাজ্যবাদ, ইহুদিবাদ ও তাদের দোসররা নিপাত যাক।

আবু মজিদ

কমাণ্ডার, ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি অফ ইরাক

৫-১১-২০০৩ বাগদাদ, ইরাক

বিশ্বায়নের নয়া আর্থিক নীতি

ফ্যাসিস্ট কর্পোরেট নীতির বিশ্বায়ন

বিশ্বায়ন পর্বে উদারনীতি ও বেসরকারীকরণ — যা নয়া আর্থিক নীতি হিসেবে চালানো হচ্ছে তা মৌলিক অর্থে মোটেই নয়া নয়। এতে বেসরকারি উদ্যোগকেই যাবতীয় উৎপাদনের প্রধান ধারা হিসাবে রক্ষা করা, গড়ে তোলা, ত্বরান্বিত করার প্রক্রিয়ায় সরকার পরিচালকের ভূমিকা পালন করে। ইতিহাসে দেখা যাবে, দেশে দেশে এই অর্থনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যেমন এক, তেমনি তা পূরণ করার ক্ষেত্রে পদক্ষেপগুলিও কমবেশী ছকে বাঁধা। শুধু তাই নয়, এই অর্থনৈতিক বনিয়াদকে ভিত্তি করে শ্রমিক-কর্মচারীসহ আমজনতার ওপর সুনির্দিষ্ট কতকগুলি রাজনৈতিক আক্রমণও চাপিয়ে দেওয়া হয়। দেশকালের পার্থক্যের সঙ্গে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অর্থনীতি ও রাজনীতি এবং রাষ্ট্রীয় রূপ ও মর্মবস্তুতে ঐতিহাসিক মিল থাকলেও পার্থক্যও কিছু থাকে। বুর্জোয়া গণতন্ত্র তথাকথিত অবাধ বিকাশের যুগকে পেরিয়ে বাজার সংকটের নিরসন করতে সৃষ্টি করেছে যুদ্ধ এবং অর্থনীতির সামরিকীকরণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে, নজিরবিহীন বাজারসঙ্কট ও স্থায়ী মন্দার সঙ্কটের ঘূর্ণিতে, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ওপর কল্যাণকামী কিছু ভূমিকার যা কিছু দায়বদ্ধতা অতীতে বর্তেছিল — তা ঝেড়ে ফেলে, শোষণের নির্মমতা এবং নিরঙ্কুশভাবে পুঁজিপতিশ্রেণীর আনুগত্যে ও সেবায় সরকারি প্রয়াস খুব নগ্নভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। স্থায়ী মন্দার গর্ভে নিমজ্জিত প্রাক্ যুদ্ধ পরিস্থিতির সঙ্গে বর্তমান দুনিয়ার বিস্ময়কর সাযুজ্য ইতিহাসের সব চেয়ে কালো অধ্যায়কেই মনে করিয়ে দেবে। এটা ভারতবর্ষ-বৃটেন-আমেরিকা — এক কথায় উন্নত ও অনুন্নত সমস্ত পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের এক বিশ্বজনীন রূপ। যেখানে যতটুকু খামতি আছে, তাকে সুসংহত পরিকল্পনার অধীনে আনতে গড়ে তোলা হয়েছে ডব্লু-টি-ও এবং তারই সহযোগী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাঙ্ক।

এই অবস্থার সুনির্দিষ্ট রূপ বুঝতে এবার ভারতবর্ষের কথায় আসা যাক। কেন্দ্রীয় বাজেটে আয়ব্যয়ের চূড়ান্ত হিসাবে অর্থমন্ত্রী বলেছেন, মোট ৪,৩৮,৭৯৫ কোটি টাকার বাজেটে ১,৫৩,৬৩৭ কোটি টাকার ঘাটতি। আর সরকারি কোষাগারে এই ঘাটতির অন্যতম প্রধান কারণ কী? প্রধান কারণ হচ্ছে, ক্রমবর্ধমান সামরিক খাতের ব্যয় এবং কর্পোরেট সংস্থাগুলোর জন্য বিপুল কর ছাড়। এই কর্পোরেট ট্যাক্স বর্তমানে ৩৬.৭৫% হলেও তা আদায় হয়না — আবার ছাড় দেওয়াও হয়। ইকনমিক টাইমসের (১৭-২-০৩) সার্ভে রিপোর্ট দেখিয়েছে, ২০০টা বড় কোম্পানি ২০০১-০২ সালে তাদের আয়ের ওপর ট্যাক্স দিয়েছে ২৯.৫% মাত্র, যদিও এদের আয়ের ওপর ধার্য নির্ধারিত হার ৩৬.৭৫%। আই-টি-সি ও হিন্দুস্থান লিভার — এই দু'টি বৃহৎ কর্পোরেট সংস্থা ট্যাক্স দিয়েছে যথাক্রমে ৩৩.৬% এবং ১৯.৬% মাত্র। ইতিমধ্যেই কেলকার কমিটি বলেছে, কর্পোরেট ট্যাক্স কমিয়ে করা হোক বিদেশি কোম্পানির ক্ষেত্রে ৩৫%, দেশীয় কোম্পানির ক্ষেত্রে ৩০%।

কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি জ্যোতি বসুর মুখ্যমন্ত্রীত্বে ১৯৯৪-৯৫ ও '৯৫-৯৬ আর্থিক বছরে আটটি বড় বড় কোম্পানিকে বিক্রয় কর ছাড় দেওয়া হয়েছিল ৩৯ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা। এগুলি সবই লাভজনক কোম্পানি ছিল। (সূত্র ঃ ক্যাগ রিপোর্ট, বর্তমান, ১৩ সেপ্টেম্বর '০৩)। আবার আর একটি কারণ যা ঘাটতি সৃষ্টি করছে, তা হল, হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ, যা কর্পোরেট সংস্থা ও একচেটিয়া মালিকদের মকুব করে দেওয়া হচ্ছে ও অনাদায়ী থাকছে। ২০০১-এ কেন্দ্রীয় সরকার মোট ভর্তুকি দিয়েছিল ১৪,০০০ কোটি টাকা — যখন বকেয়া করের পরিমাণ ছিল ৬৪,৭৮৪ কোটি টাকা। (টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া ২০-৩-০২), লক্ষণীয়, বাজেটে ১০০ পয়সা খরচের মধ্যে ২৪ পয়সা খরচ হয় সরকারের ঋণের সুদ মেটাতে। ১৩ পয়সা ব্যয় হয় সামরিক খাতে। ভরতুকিতে ১০ পয়সা। এই 'ভরতুকি'র জন্যই নাকি ঘাটতি পড়ে বাজেটে! আবার এই ভরতুকির মোটা অংশই যায় মালিকদের পকেটে। ঘাটতির এই টাকা আসে কোথা থেকে? আসে জনগণের ওপর বোঝা চাপিয়ে। যেমন ২০০৩-০৪ আর্থিক বছরে রেলের যাত্রীভাড়া ও মাশুল বাড়িয়ে ২২২০ কোটি টাকা তোলার ব্যবস্থা হল। তার আগে ২০০১-এ ৮৬০ কোটি টাকা তোলা হল যাত্রীনিরাপত্তার ধুয়া তুলে টিকিটে সারচার্জ বসিয়ে। এই টাকা তোলা হয় জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে, পেনশন-বোনাস কেটে নিয়ে, গচ্ছিত টাকায় সুদ কমিয়ে, পরিষেবাকে মহার্ঘ পণ্য করে তুলে।

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য নতুন পেনশন প্রকল্প কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বৈঠকে অনুমোদিত হল। ২০০৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে যারা চাকরিতে যোগ দেবেন, তাদের ক্ষেত্রে ওই প্রকল্প কার্যকরী হবে। নতুন পেনশন স্কীম অনুযায়ী বেতন ও মহার্ঘভাতার ১০% কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের পেনশন খাতে রাখা বাধ্যতামূলক। জেনারেল প্রভিডেন্ট ফাণ্ড তুলে দেওয়া হচ্ছে, পেনশন খাতে সমপরিমাণ অর্থ সরকার জমা রাখবে। এই টাকায় আয়কর ছাড়-এর সুবিধা পাওয়া যাবে। অবসর পাওয়ার পর এই টাকার ৪০% বাধ্যতামূলকভাবে স্বীকৃত কোন বিমা সংস্থায় বাৎসরিক বিমা প্রকল্পে রাখতে হবে। এছাড়া নতুন পেনশন ফাণ্ড দেখভাল করবে পৃথক সংস্থা। বেতনের যে অর্থ কর্মচারীরা রাখবেন, পেনশন ফাণ্ড ম্যানেজার সংস্থাগুলি এই অর্থ কোথায় কীভাবে রাখবে তা স্থির করে দেবে। এই টাকা কর্মচারীরা খাটাবেন। সরকারি সংস্থার শেয়ারে ৬০%, কর্পোরেট বণ্ডে ৩০%, ইক্যুইটিতে ২০% অর্থ বিনিয়োগ করতে পারা যাবে। আবার ৪০% জি-সেকসনে, ৪০% কর্পোরেট বণ্ডে, ৫০% ইক্যুইটিতে এবং বাকি অর্থের অর্ধেক সরকারি বণ্ডে ও অর্ধেক কর্পোরেট বণ্ডে বিনিয়োগ করা যাবে।

টেলিকম বাদ দিলে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর সামগ্রিক পেনশনের বোঝা ২৩,১৫৮ কোটি টাকা — জাতীয় আয়ের ১.৬৬%। গত দশ বছরে পেনশন ২১% যৌগিক হারে বেড়েছে। এই যুক্তিতে নতুন প্রকল্পে সরকার আর্থিক বোঝা নিজের ঘাড় থেকে নামাতে চাইছে। পেনশনের টাকা সরাসরি বেসরকারি খাতে চলে যাচ্ছে। বর্তমানে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সুযোগসুবিধা পাওয়া যাবে না। কর্মচারীরা একটা প্রক্রিয়ায় নিজের ইচ্ছেমতো টাকা বিনিয়োগ করে টাকা তুলে নেবে। এমনই সোনার হরিণ কর্মচারীদের সামনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পেনশনের ৪০% বাধ্যতামূলক বিনিয়োগ — ইচ্ছা- অনিচ্ছার প্রশ্ন নেই। ঐ টাকা নগদে হাতে পাওয়ার উপায় নেই। সদ্য আওয়াজ তোলা হয়েছে — পেনশনভোগীদের আর ডি-এ দেওয়া হবে না। 'পেনশন' কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? এটা আসলে সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার অঙ্গ। মালিক এবং সরকার — যার অধীনে শ্রমিক কর্মচারী কাজ করে, এই সামাজিক সুরক্ষার দায় তারই। সুপ্রীম কোর্ট এক সময় তার রায়ে বলেছিল ঃ "Pension is a valuable right of a government servant and the right to receive pension is property under Article 31 of the Constitution''. সোজাসাপ্টা মানে হল, এটা একটা মূল্যবান অধিকার এবং এই অধিকার সংবিধানের ৩১নং ধারা অনুযায়ী সম্পত্তি হিসাবে গণ্য।

মাত্র কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় সরকার পি-এফ'র সুদ ১২% থেকে কমিয়ে ৯.৫% করে কর্মচারীদের সর্বনাশ করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার পি-এফ'র মৌলিক অধিকার ও আইনের মর্মবস্তুকেই ধীরে ধীরে খতম করে দিচ্ছে। বলাবাহুল্য অনুরূপভাবে এক্ষেত্রেও রাজ্য সরকার জি-পি-এফ ও সি-জি-এফের সুদ ১.৫% ছাঁটাই করেছে। অল্প সুদে মালিকদের ঋণ পাওয়ার সুব্যবস্থা করতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ক্রমাগত ব্যাঙ্ক রেট কমিয়ে যাচ্ছে। এজন্য ব্যাঙ্কে জমা টাকার ওপর সুদ কিন্তু ক্রমাগত কমছে সাধারণ মানুষের। বর্তমানে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৬-৭% এর মত। নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষ, বিশেষত অবসরকালীন সময়ে এই সুদের টাকায় যাদের চলতে হয়, তাদের জীবিকার ওপরই এটা মস্ত আঘাত।

২০০০ সালের পর থেকেই বিজেপি সরকার ও অর্থমন্ত্রী যশোবন্ত সিন্‌হা বলছেন, মুদ্রাস্ফীতির হার অতীতে ৭% বা তার বেশি ছিল। সেটা কমে হয়েছে ৪% বা তার কাছাকাছি। মুদ্রাস্ফীতির হার কমেছে বলে প্রকৃত সুদ নাকি খুব বেড়ে গিয়েছিল এবং টাকার অঙ্কে সুদ একই থাকলেও, মুদ্রাস্ফীতি কমার জন্য ঐ একই পরিমাণ টাকায় আমানতকারী বেশি জিনিস কিনতে পারছিল। কাজেই তাদের বক্তব্য, প্রকৃত সুদ বেড়ে গেছে, তা কমানো দরকার। এই কুযুক্তিতে কমানো হল সুদ। সুদ কমানোর এই যুক্তিটাই এখনও চলছে। ঋণের উপর সুদ কমায় মালিকদের মুনাফা বেড়েছে ভাল হারে। অথচ সাধারণ মানুষের কেনবার মত দরকারী জিনিসপত্রের দাম বেড়েই চলেছে। মূল্যবৃদ্ধির হার ১৫-২০%। পানীয় জল, সার, সেচের জল, বীজ, কীটনাশক, বিদ্যুৎ, পরিবহন, শিক্ষা, চিকিৎসা, খাদ্য-বস্ত্র-জামা-কাপড় থেকে শুরু করে প্রতিটি আবশ্যিক পরিষেবা ও পণ্যের দাম বেড়েছে বিপুল হারে। তবুও জমা টাকার উপর কেবল ব্যাঙ্কেই নয়, স্বল্পসঞ্চয় প্রকল্পগুলিতেও সুদের হার কমানো চলছেই।

যখন মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ৫.৯৯%, তখন ইকনমিক টাইমস (১১-৪-০৩) পত্রিকা এক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ দিয়েছে যে, গত ১২ বছরে এই প্রকৃত সুদের হার শূন্যের নীচে নেমে গিয়েছে। অর্থাৎ সুদ থেকে প্রকৃত আয় হচ্ছে না কিছুই। বরং জমা টাকার মূল্যই কমে যাচ্ছে। শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক সব ধরনের স্থায়ী রোজগেরে মানুষের ক্রয়ক্ষমতার এই ভয়াবহ সংকোচনের মাধ্যমে সরকার একচেটিয়া মালিকগোষ্ঠী এবং কর্পোরেট সংস্থাগুলির মুনাফার ক্ষুধা মিটিয়ে চলেছে। সর্বোচ্চ মুনাফার ক্ষুধাই আজ সর্বগ্রাসী। তার ফলে ক্রয়ক্ষমতার সংকোচন বাড়িয়ে দিচ্ছে বাজার সঙ্কট। কমছে চাহিদা।

মাসে সাড়ে ছ'হাজার টাকা পর্যন্ত যাঁরা বেতন পান, তেমন কর্মীরা এখন ই এস আই-এর মাধ্যমে চিকিৎসা পেতে পারেন। কেন্দ্রীয় সরকারের অধিগৃহীত সংস্থায় ই এস আই-এর টাকা মেটানো হয়নি। এই অর্থের পরিমাণ ১৩ কোটি টাকা বলে রাজ্য সরকারি সূত্রে জানা যায়। এছাড়া বেসরকারি মালিকানাধীন ৫৪টা সংস্থাও পাওনা টাকা দিচ্ছে না। এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে রাজ্য সরকারও কম যায় না। রাজ্যের অধিগৃহীত ২৯টা সংস্থার বকেয়ার পরিমাণ ১১ কোটি টাকা। ফলে বেশ কিছু সংস্থার দরজায় তালা ঝুলছে। এ সবের নীট ফল চিকিৎসাক্ষেত্রে সুরক্ষার যে ব্যবস্থাটুকু ছিল, সেই সুযোগ ও অধিকার কার্যত লুপ্তপ্রায়। কলকারখানার মালিকরা যেমন শ্রমিক-কর্মচারীদের গচ্ছিত টাকা মেরে দিয়ে কেটে পড়ছে, কলকারখানা বেচে দিয়ে শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতি দায়দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলছে — কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারও অনুরূপ ভূমিকা নিচ্ছে। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের ২৫ কোটি টাকা সরকার দিতে পারে নি। সম্প্রতি বোনাসও দিতে পারছে না।

ভারতের সংস্কার কর্মসূচি ও দারিদ্র্য দূরীকরণ শীর্ষক রিপোর্ট নিয়ে সম্প্রতি আলোচনা হল। ভারতবর্ষের 'উন্নয়ন নীতি' নিয়ে বিশ্বব্যাঙ্কের এটাই প্রথম সমীক্ষা রিপোর্ট। তাতে আক্ষেপ করে বলা হয়েছে, ভারত তার ঘোষিত লক্ষ্য পূরণ করতে পারছে না। দশম যোজনায় উন্নয়নের হার ৮%-এ পৌঁছুতে পারবে না। শুধু তাই নয় — উন্নয়নের হার বাড়ার বদলে কমছে। গড় বার্ষিক হার '৯২-'৯৩ থেকে '৯৬-'৯৭-এ ছিল ৬.৭%। '৯৭-'৯৮ থেকে ২০০১-০২-এ তা কমে হয়েছিল ৫.৪%। সর্বশেষ ২০০২-০৩-এ তা আরও কমে হয়েছে ৪.৪%। পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে নির্দেশে বলা হল ঃ (১) বাজেট ঘাটতি কমানোর জন্য পরিষেবাকে আরও উৎপাদনশীল করা (শিল্প-কৃষি সহ); (২) দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচির ওপর জোর দেওয়া; (৩) লগ্নীর পরিবেশ উন্নত করা। বস্তুতপক্ষে ভারত সরকার এই লক্ষ্যেই চলছে। তার গতি সর্বক্ষেত্রে আরও বাড়াতে বলছে বিশ্বব্যাঙ্ক।

প্রশ্ন হল, উৎপাদনশীলতা যা আছে তাকেই কি রক্ষা করা যাচ্ছে? তার সদব্যবহার হচ্ছে কি? হচ্ছে না। বাজার বলতে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বোঝায় ক্রয়ক্ষমতাসম্পন্নতা। এমন মানুষের সংখ্যা এদেশে ১২-১৫%। কোটি কোটি বেকার। বেকারির প্রকৃত হিসাব নেই। ৭৪% মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে। কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকার করে ৩৬.৫% মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে। কৃষিপণ্য ও শিল্পজাত পণ্যের দামে ক্রমবর্ধমান ফারাকের ফলে উৎপাদনের উপকরণ চলে যাচ্ছে পুঁজিপতি ও ধনীচাষীর হাতে। ১৯৫৩-৫৪ সালে ভারতবর্ষের গ্রামীণ পরিবারের ৩১.৪৩% ছিল প্রান্তিক চাষী। দুই দশক পরে দেখা যাচ্ছে, গ্রামীণ পরিবারের ৪৩.৯৯% প্রান্তিক চাষীতে রূপান্তরিত হয়েছে। তাদের গড় জমির পরিমাণ ০.২৭ একর থেকে কমে হয়েছে ০.১ একর। ক্ষুদ্র ও মধ্যচাষীর ক্ষেত্রেও জমির পরিমাণ কমেছে। ১৯৫৩-৫৪ সালে এই তিন ধরনের চাষীর সংখ্যা ছিল ৮৯.৯৫%, দু'দশক পরে তা হয়েছে ৯৪.৫৭%। এই তথ্য প্রমাণ করছে ৫% পরিবারের হাতে চাষযোগ্য জমি প্রায় সমস্তই কেন্দ্রীভূত হয়েছে (সূত্র : বিশ্বায়নের পথে ভারতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন, অজিতকুমার রায়, পথিকৃৎ)। গ্রামীণ জনসংখ্যার এই গরিবায়নের ফলে সঙ্কুচিত বাজার আরও সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। 'দারিদ্র্য দূরীকরণ' নিয়ে আকাশ

সাতের পাতায় দেখুন

ভারতবর্ষ হয়ে উঠেছে কর্পোরেট রাষ্ট্র

ছয়ের পাতার পর

ফাটানো আওয়াজ এই জন্যই তোলা হচ্ছে। অন্নপূর্ণা যোজনা আর বি-পি-এল তালিকার ব্যবস্থাটা কেন্দ্র ও রাজ্যের চেষ্টায় রূপায়ণ যদি কিছু হয়ও — তবে তা হবে কোরামিন দিয়ে সস্তার মজুর হিসাবে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা মাত্র এবং লোকঠকানোর কৌশল।

আজ পেনশন, বোনাস, বেতন ইত্যাদি উল্লেখ করে কেন্দ্র-রাজ্য বোঝাতে চাইছে, এটা 'অর্থনৈতিক বোঝা'। এই বোঝা কমাতে হবে বলে এইসব ক্ষেত্রে সুযোগসুবিধা ছাঁটাই করতে হচ্ছে, চুক্তিতে নিয়োগের যৌক্তিকতা বোঝানো হচ্ছে। এ নিয়ে নানা মহলে খুব হৈচৈ। লক্ষণীয়, ১৯৯০-৯১ সালে কেন্দ্রীয় সরকার মজুরি-বেতন বাবদ প্রশাসনিক খাতে ব্যয় করত ১২,৬০৬ কোটি টাকা। ২০০১-০২-এ তার পরিমাণ ছিল ৩৬,৬৬৯ কোটি টাকা। এই বিপুল ব্যয়বৃদ্ধির কত অংশ মন্ত্রী, এম-এল-এ, ভি-আই-পিদের নিরাপত্তায় গেছে?

সাধারণ কর্মচারীদের পিছনে যেটুকু ব্যয় হয় — তা অতীতের ৩ গুণ হলেও সরকারি স্বীকৃত তথ্য অনুযায়ী ভোগ্যপণ্যের দামবৃদ্ধি হয়েছে ২-৪ গুণ। এইভাবে পকেট কেটে বোঝা হাল্কা করে ফেলা হয়। ১৯৭৪-এ রেলের কর্মীসংখ্যা ১৮ লাখ থেকে ১৯৮৮-তে হয়ে গেল ১৩ লাখ। ১৯৮৫-র আগের দশ বছরে আধুনিকীকরণের ফলে টিসকোতে ১৫ হাজার, টাটা কোলিয়ারীতে ৩৭ হাজার কর্মীকে বিদায় দেওয়া হয়েছে। ডাক-তার বিভাগে ৩ লাখ শূন্যপদ বাতিল করার ঘটনাও কয়েক বছর আগে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিল। এফ সি সি আই'র প্রকাশ্য ঘোষণা — "শ্রমিক ছাঁটাই-এ অনুমতি দান আধুনিকীকরণের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।" (বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড)। তবে এটা কী এমন নতুন কথা হল? পুঁজিবাদে শ্রমিক ছাঁটাই ছাড়া আধুনিকীকরণ কোন্ কালেই বা হয়েছে? আই এল ও'র রিজিওনাল টিম '৮০-র দশকে যে অর্থনৈতিক উদারনীতি শুরু হয়েছে তার ওপর সমীক্ষা চালান। তাঁরা বলেন, ১৯৮৯ থেকে ভারতের সংগঠিত নির্মাণশিল্পে চাকুরিতে বন্ধ্যা দশা চলে গেছে চূড়ান্ত স্তরে। আর এটাই হল সমীক্ষকদের বর্ণনায় "ভারতীয় অর্থনীতির উদারনীতির দশক।" ছাঁটাই-ক্লোজারকে 'বিদায়নীতি' নাম দিয়ে ভাড়াটে পণ্ডিতরা অর্থনৈতিক সঙ্কট সমাধানের দাওয়াই দিচ্ছেন। এটাই এখন অবাধ এবং রীতিমত বৈধ ব্যবস্থা। এসব কিছুরই সম্মিলিত ফলাফল বাজার সঙ্কটের তীব্রতা বৃদ্ধি।

"বিদায়নীতির মাহাত্ম্য নিয়ে বুকনির পাশাপাশি হৈচৈ হচ্ছে পুঁজিনির্ভর শিল্প নিয়ে। সরকার ও মালিকদের কী গম্ভীর গালভরা বক্তৃতা! যেন শিল্পের পুঁজিনির্ভরতা পুঁজিবাদে ছিল না। মুনাফার গ্যারান্টি করতে, প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে, ক্রমসঙ্কুচিত বাজার থেকেই ফায়দা তুলতে মালিকরা কোন্ কালেই বা বেশি বেশি পুঁজি ঢেলে আধুনিকীকরণ করেনি? এই আধুনিকতা বিশেষ সময়ের সর্বোন্নত প্রযুক্তিকেই বোঝায়। আজ যেমন এসেছে কমপিউটার। হাইটেকনোলজির 'হাই' কথাটা সব সময়য়েই তুলনামূলক বিচার। এটা চলমান প্রক্রিয়া। প্রযুক্তিবিদ্যার ক্রমোন্নতি ধারাবাহিক কায়িক শ্রমনির্ভরতা কমিয়ে চলেছে। আজও তাই হচ্ছে। কারিগরী উন্নতি মানেই — শ্রম সময়ের ঘণ্টা কমানো, মানে কম সময়ে বেশি কাজ, মানেই হল কম শ্রমিকের খাটুনি কিনে একই শ্রম-সময়ে অল্প খরচে বেশি লাভ। যতবারই তা করতে হয়, ততবারই মজুর ছাঁটাই হয়। ফলে বেকারি বাড়ে। এর অর্থ বাজার আরও কমে, সঙ্কট আরও বাড়ে। আবার সঙ্কটের তীব্রতার সামনে আবার ছাঁটাই, ক্লোজার, চুক্তির রদবদল, বেতন-মজুরি সংকোচন ঘটে। আবার আধুনিকীকরণ হয়। অভাবী খাটুনির লোভ বাড়তে থাকে। নিট ফল যোগান বাড়ে, চাহিদা কমে। আবার মজুরি কমে, কমে শ্রমিকের সংখ্যা। এটাই হয়, হচ্ছে, হবেও — যতদিন পুঁজিবাদ থাকবে। এখানে উৎপাদন যন্ত্রের পূর্ণ ক্ষমতার ব্যবহার হয় না। কারখানা বন্ধ রাখতে হয় বলে, উদ্বৃত্ত অবিক্রীত পণ্য মজুদ থাকে বলে, উৎপাদক শ্রেণী — শ্রমিকশ্রেণীরও উৎপাদনের ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহারের প্রশ্নও ওঠে না। বরং এই দুটি জিনিসকে ধ্বংস না করে পুঁজিবাদ এগুতে পারে না। শ্রমের সৃষ্ট পুঁজিকেও অলস করে রাখে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। সমস্যা পুঁজির অভাবের নয় — সমস্যা পুঁজির স্বভাবের। সারা দেশে ৫ লক্ষ কারখানা বন্ধ। ৯৩% শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছে স্রেফ লকআউট ও ক্লোজারের জন্য। এটাই সাম্প্রতিক রিপোর্ট।

গত কয়েক দশকের ইতিহাসে এই প্রথম ২০০০ সালে সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মী সংখ্যাবৃদ্ধির হার ঋণাত্মক হয়ে গেল। ১৯৯৬ থেকে এই হার কমছে এইভাবে ঃ ১৯৯৬-এ ১.৫৬%, ১৯৯৭-এ ১.০৯%, ১৯৯৮-এ ০.৪৬%, ১৯৯৯-এ ৪০%, ২০০০ সালে কমে দাঁড়াল ০.১৫%। এই বছরে সংগঠিত শিল্পে ছাঁটাই হয়েছে ৪৫ হাজার। কেন্দ্রীয় শ্রম দপ্তরের রিপোর্টে দেখানো হয়েছে, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে কর্মী সংকোচন হয়েছে ০.৭%। '৯৭-৯৮ সালে ১ লাখ ৪০ হাজার, '৯৮-৯৯ সালে ৫৯ হাজার ছাঁটাই হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ২০০১-০২-এ ছাঁটাই হয়ে গেছে ৪ লাখ ২২ হাজার শ্রমিক-কর্মচারী। ইকনমিক টাইমসের ৭-৫-০৩ সংখ্যায় বলা হয়েছে — ঠিক ঐ সময়ে ব্যাঙ্ক শিল্পে ১ লাখ চাকুরির অবলুপ্তি ঘটেছে। অভাবিত গতিতে কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার হিড়িক পড়েছে। ২০০০ সালে ১৩৮টা কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। লে-অফ হয়েছে ২০৯টা কারখানায়। বিচিত্র ব্যাপার হলো এই সর্বনাশের নামও 'গ্রোথ' বা উন্নতি! পুঁজিপতিশ্রেণীর ভাড়াটে পণ্ডিতরা ও রাজনৈতিক নেতারা নাম দিয়েছে — 'জবলেস গ্রোথ'। গ্রোথ অবশ্যই — তবে তা কর্পোরেট সংস্থা ও পুঁজিপতিদের মুনাফার অর্থেই। আর আমজনতার দারিদ্র্য, বেকারি, আর নির্মম অনাহার আর ক্ষুধার যন্ত্রণার অপরিমেয় "গ্রোথ"। ২০০১-২০০২ এই মাত্র এক বছর সময়ে ৪ লাখ ২০ হাজার সরকারি চাকরির পদ তুলে দেওয়া হয়েছে। ২০০১-এর মার্চ মাসের হিসেব অনুযায়ী রুগ্ন ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা ২,৪৯,৬০টি। মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পের সংখ্যা ৩৩১৭টি, এর মধ্যে সরকারি সংস্থা ২৫৪টা। বাকিগুলো বেসরকারি। (আনন্দবাজার ৮-৫-০৩)

নারী ও পুরুষ শ্রমিকের মজুরির পার্থক্য অনেক। নারী শ্রমিকের মজুরি কম বলে নারী শ্রমিকের অনুপাত বাড়ছে মুনাফার হার বাড়াতে, উৎপাদন খরচ কমাতে। ২০০১-এর প্রকাশিত সেন্সাস রিপোর্ট-এ জানানো হয়েছে, '৯১ সালে এই হার ছিল ২২.৩%, অথচ ২০০১-এ হয়েছে ২৫.৬%। একই যুক্তিতে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা বেড়েছে বিপুল হারে। শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ১ কোটি। চমকে যাওয়ার মত সংখ্যা। দক্ষিণপন্থী ও সরকারি বামপন্থী সমস্ত দলের নেতারা এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার প্রতিটি নির্বাচনে কর্মীসংকোচনের জবাবে বলে থাকেন — কাজ যেমন যাচ্ছে, কাজ হচ্ছেও। এবং কর্ম সংস্থানের প্রতিশ্রুতিতে কত লাখ, কত কোটি কাজ পাবে তাও ঘোষণা তাঁরা করে দেন। এ যে কতবড় মিথ্যাচার হিসেব দেখলেই বোঝা যাবে। ২০০০ সালে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সংস্থায় ও অধিগৃহীত সংস্থায় কাজ পেয়েছে মাত্র ১২ হাজার ৫২০ জন, কেন্দ্রীয় সরকারে ৪১৩ জন, বাকিটা রাজ্যের। ২০০২-এ এই চিত্র আরও শোচনীয়। সরকারি সংস্থায় চাকুরি পেয়েছে ৭ হাজারের কিছু বেশি। শূন্যপদের সংখ্যাও কমেছে। (বর্তমান ১৭ মার্চ, ০৩)

স্থায়ী চাকুরির বদলে আসছে ঠিকা — ক্যাজুয়াল শ্রমিক কর্মচারী। যেমন রাজ্য সরকার সম্প্রতি ঘোষণা করেছে, ৭০ হাজার শিক্ষক নেওয়া হবে ঠিকায়। নেতা ও মন্ত্রীরা যাই বলুন, উপরোক্ত তথ্য থেকে যে বাস্তব ছবিটা বেরিয়ে আসে তাকে সরকার, নেতা, মন্ত্রী অথবা বিশেষজ্ঞদের কোনোরকম 'মনে করা' ও 'বিশ্বাস' অথবা 'অনুমান' দিয়ে নস্যাৎ করা যাবে না। ভয়াবহ সর্বাত্মক সঙ্কটের চক্রে ভারতবর্ষের পুঁজিবাদী অর্থনীতি আবর্তিত হচ্ছে — আর তাকে অক্ষয় অমর করে রাখতে শ্রমিক-কর্মচারীদের জীবনে নেমে এসেছে ইতিহাসের নজিরবিহীন দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক নিষ্পেষণ, অর্জিত অধিকারের সংকোচন। ভারতবর্ষ হয়ে উঠেছে কর্পোরেট রাষ্ট্র।

(অবশিষ্ট অংশ পরের সংখ্যায়)

দলগাঁও চা-বাগানের হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে

তিনের পাতার পর

উপরে বর্তমানে মালিকপক্ষ যেভাবে আক্রমণ হেনে চলেছে, সেখানে এই জ্বালাযন্ত্রণা শতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিষ্ঠিত নামী ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের মদতে যেসব বন্ধ চা-বাগানের দরজা খুলেছে, সেখানেও মালিকরা অর্ধেক বেতনে শ্রমিকদের কাজ করতে বাধ্য করছে। বেতনের অংশ হিসেবে দেয় রেশন বন্ধ, জ্বালানি বন্ধ, হাসপাতালের সুযোগ বন্ধ, এমনকি জল সরবরাহ বন্ধ। বাগানে নিয়োগ বন্ধ, মালিকপক্ষ নিয়োগের চুক্তি করেও খেলাপ করে চলেছে। সরকারের ভূমিকাও নিন্দনীয়। শ্রমিকের দুঃখদুর্দশার প্রতি উদাসীন সরকার কেবল বৈঠক আর বৈঠক করে চলেছেন। এতে শ্রমিকদের ধৈর্যের বাঁধন ভাঙতে চলেছে। তাই যেকোন ইস্যুকে ভিত্তি করে পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ ফেটে পড়তে চাইছে। তাছাড়া দলগাঁওতে যা ঘটেছে সেটা সি পি এমের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফল। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব কোন আদর্শগত বিরোধকে কেন্দ্র করে নয়। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব হচ্ছে দুর্নীতিগ্রস্ত রাস্তায় প্রাপ্ত বিপুল অর্থ ও নানা সুযোগসুবিধার ভাগবাটোয়ারা নিয়ে। এই দ্বন্দ্ব দীর্ঘদিন সি পি এম সামলাতে পারলেও তা বর্তমানে এত তীব্র আকার ধারণ করেছে যে, তা আর সামলানো তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। ফলে শুধু দলগাঁওতে নয়, বহু জায়গায় এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। সঠিক দিশার অভাবে সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ফেটে পড়ছে সি পি এম নেতাদের বিরুদ্ধেই। আর তাই আক্রমণকারী, আর আক্রান্ত একাকার হয়ে যাচ্ছে। সি পি এম নেতারা ভেবে ঠিক করতে পারছেন না — কাকে সমর্থন করবেন, আর কাকেই বা শত্রু বানাবেন। দলগাঁও চা-বাগানে যদি সিট্যুর একচ্ছত্র আধিপত্য না থাকত, তবে হয়তো চতুর সি পি এম নেতারা ভিন্ন ইউনিয়নের নেতাদের 'বলির পাঁঠা' করে পার পাবার চেষ্টা করতে পারতেন! কিন্তু এখানে তা অনুপস্থিত বলেই 'সমাজবিরোধী ও মদ-জুয়ার' বিরুদ্ধে আন্দোলনের ছুতো খাড়া করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাও ধোপে টেকেনি। কারণ তারকেশ্বর লোহারের বাড়িতেই মিলেছে বহু মদের বোতল। তাই এই 'ছুতো'টিই হাস্যকর হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

বাস্তবে এটা হল, সি পি এমের 'শ্রমিকস্বার্থবিরোধী, জনবিরোধী নীতির ও বাস্তব প্রতিফলন। বলা যায়, আত্মঘাতী সংঘর্ষের আড়ালে আসলে শ্রমবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে বিস্ফোরণ! এই বিস্ফোরণের ভাষা যদি সি পি এম নেতৃত্ব বুঝতে চান তবে তাদের খতিয়ে দেখতে হবে, তাদের অনুসৃত মালিকতোষণকারী ও শ্রমিকবিরোধী শ্রমনীতির জনবিরোধী চরিত্রটিকে। এটাকে ধামাচাপা দিলে দ্বিচারিতা অনিবার্য।

বসিরহাট মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন

বসিরহাট মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার গাফিলতিতে গত ২৬ অক্টোবর গোবিন্দ দাসের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে এস ইউ সি আই বসিরহাট লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে ২৮ অক্টোবর চিকিৎসক-নার্স-কর্মচারীদের স্বাস্থ্য পরিষেবা বিষয়ে সচেতন করা, মৃত্যুর কারণ উদ্‌ঘাটন, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়া এবং জরুরি বিভাগে অধিক রাতে রোগী ভর্তি করার দাবিতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। কমরেড নিত্যানন্দ ঘোষ, কমরেড অজয় বাইন ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন।

ভর্তি হতে না পেরে আবারও রুগীর মৃত্যু

কমরেড প্রভাস ঘোষের বিবৃতি

এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৭ নভেম্বর নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন ঃ

"সুস্মিতা বিশ্বাসের পর পি জি হাসপাতালে ভর্তির সুযোগে বঞ্চিত ২৪ ঘন্টা গাছতলায় পড়ে থাকা মুমূর্ষু রুগী বাদল চক্রবর্তীর মৃত্যু পুনরায় রাজ্য সরকারের নিষ্ঠুর, অমানবিক, জনবিরোধী স্বাস্থ্যনীতির মর্মন্তুদ চিত্রই তুলে ধরেছে।

যতক্ষণ স্বাস্থ্য বাজেট ও বেডের সংখ্যা না বাড়ানো হচ্ছে, নতুন নতুন হাসপাতাল খোলা এবং পরিকাঠামোর উন্নতি না হচ্ছে, হাসপাতালে সরকারি দলীয় আমলাতান্ত্রিক ও দুর্নীতিচক্র না ভাঙা হচ্ছে, ততক্ষণ এই ধরনের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটতেই থাকবে। সরকারের জনবিরোধী স্বাস্থ্যনীতির বিরুদ্ধে রাজ্যবাসীকে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আমরা আবেদন জানাচ্ছি।"

MM & PO /WB / RNP 288/2003 R. No 5268 / 60

গণদাবী ২১ নভেম্বর, ২০০৩ ৫৬ বর্ষ / ১৪ সংখ্যা

এই হল সিপিএম রাজনীতির শিক্ষা

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে লোহার রড হাতে মারমুখী ঐ যুবকটি কে ? কোনও দাগী ক্রিমিনাল নয়, সি পি এমের ছাত্র সংগঠন এস এফ আই পরিচালিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংসদের সহ সম্পাদক। তার রডের লক্ষ্য হচ্ছে একজন সম্পূর্ণ নিরস্ত্র ডি এস ও ছাত্রীকর্মী। ১০ নভেম্বর ডি এস ও'র ডাকা ছাত্র ধর্মঘট ভাঙতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এভাবেই রড-লাঠি নিয়ে ডি এস ও কর্মীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এস এফ আই বাহিনী। পুলিশ উপস্থিত থেকেও নীরব দর্শকমাত্র। একইভাবে ঐদিন রাজ্যের সর্বত্র ডি এস ও কর্মীদের ওপর আক্রমণ সত্ত্বেও ছাত্র ধর্মঘট সম্পূর্ণ সফল হয়। (ছবি ঃ হিন্দুস্থান টাইমস ১১.১১.০৩)

নির্বাচন প্রার্থীদের জামানত বৃদ্ধি
কেন্দ্রীয় কমিটির তীব্র প্রতিবাদ

নির্বাচন প্রার্থীদের জামানতের টাকার পরিমাণ বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ব্যক্ত করে এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ১০ নভেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার সকল বুর্জোয়া পরিষদীয় দলগুলির মদতে ও সহযোগিতায় লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থীদের ক্ষেত্রে জামানতের টাকা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পদক্ষেপ নিয়েছে। এর ফলে লোকসভার প্রার্থী পিছু ২০,০০০ টাকা ও বিধানসভার প্রার্থী পিছু ১০,০০০ টাকা জমা রাখতে হবে। অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য হচ্ছে, গরিব সাধারণ মানুষকে গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়ার বাইরে নিক্ষেপ করে একমাত্র পুঁজিপতিশ্রেণী ও তাদের এজেন্টদের জন্য নির্বাচন ক্ষেত্রকে সংরক্ষিত করা, অর্থাৎ সমাজের ওপরতলার মানুষদেরই কেবল নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ব্যবস্থা করা। এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সি পি আই (এম) ও সি পি আই-এর নিষ্ক্রিয় মনোভাবের উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই বিষয়ে সর্বদলীয় সভায় এই দুই দলের বিরুদ্ধতা ছিল নামমাত্র প্রতিবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই প্রতিবাদ এতই দুর্বল ছিল যে, স্পষ্টতই এই ধরনের একটি হীন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সরকারকে তা এক ইঞ্চি ও নড়াতে পারেনি। কমরেড মুখার্জী বলেন, এই বিধবংসী প্রয়াসকে রুখে দেওয়ার জন্য শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হলে তা দেশে ফ্যাসিস্ট শাসন কায়েম করতে পুঁজিপতিশ্রেণীর হাতকেই শক্ত করবে, যার পরিণামে কেবলমাত্র তাদের বিশ্বস্ত ও পছন্দের দলগুলিই নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবে। পুনরায় সি পি আই(এম) ও সি পি আই-এর কাছে সঠিক ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে এই পদক্ষেপের প্রতিরোধে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তিনি বিশেষভাবে আবেদন জানান। সাথে সাথে দেশের মাটি থেকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে মুছে দিতে এই যে চক্রান্ত চলছে তার বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে এবং ধারাবাহিক দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তুলে এই ফ্যাসিস্ট পরিকল্পনাকে প্রতিহত করতে তিনি দেশের অন্যান্য বাম ও গণতান্ত্রিক দল ও গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন জনগণের কাছে আহবান জানান।

প্রতি বছর ২০ মার্চ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দিবস হিসাবে পালন করার ডাক

পাঁচের পাতার পর

মনোরঞ্জন মহান্তি কনভেনশনের সভাপতি ডঃ সুশীল মুখার্জীকে ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতীক রূপে অভিহিত করে বলেন, আজ দেশে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে দেশের মধ্যকার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত করতে হবে। তিনি সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের নানান দিক উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, ভারতে ভি এইচ পি, আর এস এস-এর সাম্প্রদায়িক প্রচারের জন্য আমেরিকার সিলিকন ভ্যালি থেকে টাকা আসছে।

এছাড়াও বিহার থেকে অধ্যাপক ও পি জয়সোয়াল ও রামকিশোর প্রসাদ, ঝাড়খণ্ড থেকে অধ্যাপক বিজয়কুমার পিয়াস, উত্তরপ্রদেশে থেকে অধ্যাপক সুধাংশু মালব্য, পাঞ্জাব থেকে অমরিন্দর পাল সিং ও অন্যান্য প্রদেশ থেকে আরও অনেকে বক্তব্য রাখেন।

বিদেশের বহু দল ও সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে সংহতিবার্তা পাঠানো হয়। কিউবা, রাশিয়ার অল ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টি অফ বলশেভিকস্, ওয়ার্কার্স কমিউনিস্ট পার্টি অফ নরওয়ে, কমিউনিস্ট পার্টি অফ জর্ডান, জার্মানির 'অফেনসিভ' পত্রিকার সম্পাদক ফ্র্যাঙ্ক ফ্লেজেন, ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টি এ্যালায়েন্সের পক্ষে জন গ্রিন, পাকিস্তান থেকে ফেডারেল ইউনিয়ন অফ জার্নালিস্টস্-এর প্রেসিডেন্ট আহফাজ উর রহমান ও ন্যাশানাল লিবারেশন আর্মি অফ ইরাক।

ভারতের খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ অধ্যাপক রামশরণ শর্মা তাঁর পাঠানো বার্তায় বলেন, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিরামহীন লড়াই চালানোর জন্য এরকম একটি সংগঠনের খুবই প্রয়োজন ছিল।

মূল ঘোষণাপত্র, কিছু সংশোধন-সংযোজন সহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। কনভেনশন থেকে দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের কর্মপ্রক্রিয়া ও কর্মসূচিও ঘোষণা করা হয়েছে।

বলা হয়েছে — এই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন শান্তিবাদী (pacifist) আন্দোলন হবে না, একে জঙ্গি আন্দোলনের রূপে গড়ে তুলতে হবে। প্রতিটি দেশের শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সেই দেশের জনগণের মুক্তিসংগ্রামের পরিপূরক করেই এই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এপথেই সাধারণভাবে বিশ্বপুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করা যাবে।

প্রতিটি দেশেই এই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম সেই সেই সরকারগুলির উপর চাপ সৃষ্টি করবে, যাতে ইরাকে সৈন্য পাঠানো থেকে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে কোন-প্রকার সামরিক সহযোগিতা, চুক্তি ও যৌথ মহড়া থেকে, সেই সেই দেশের কর্পোরেট সংস্থাগুলিকে ইরাকে মার্কিন সামরিক কমাণ্ডের সাথে অথবা ইরাকি গভর্নিং কাউন্সিলের সাথে মিলিটারি সম্পর্কিত কোনরকম চুক্তি করা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করা যায়।

প্রতিরোধ সংগ্রামে ইরাকিদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবার জন্য দেশে দেশে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের লক্ষ্যে এই আন্দোলনকে এগিয়ে যেতে হবে।

ব্রিটিশ মার্কিন পণ্য বয়কটের কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে এই আন্দোলনকে।

প্রতি বছর ২০ মার্চ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দিবস হিসাবে পালন করার জন্য দেশে দেশে জনগণকে অনুপ্রাণিত করতে হবে।

দুদিনব্যাপী কনভেনশন শেষ হল 'উই শ্যাল ওভারকাম' সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে। আমেরিকার ইণ্টারন্যাশানাল এ্যাকশন সেণ্টারের প্রতিনিধি হিথার কোটিন যখন মাইকের সামনে গান ধরলেন, গোটা হল দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে অভিনন্দন জানাল, গলা মেলাল তাঁর সাথে।

১৫-১৬ নভেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কনভেনশনে যোগদানকারী ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দের একাংশ

সম্পাদক মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৪৪-০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net